হইয়া পড়েন। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু 'সত্তা' অর্থে প্রকৃতির অস্তিত্বকেই বুঝেন, তাই তাঁহারা এই সূত্রটীর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফল একই, অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রমাণিত হয় নাই। এখানে এই কথা দেখিতে হইবে যে যদি তাঁহাদের ব্যাখ্যাই ঠিক হইত, তাহা হইলে সূত্রের বাক্য এইরূপ হইত—"প্রধানসত্তামাত্রাচ্চেৎ" অথবা "তৎসত্তামাত্রাচ্চেৎ" অর্থাৎ "যদি প্রধান বা প্রকৃতির অস্তিত্ব হেতু"; সুতরাং 'সত্তা' শব্দে ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব বুঝান উচিত, প্রকৃতির নহে।

সাংখ্যদর্শন যে তিনটী প্রমাণ স্বীকার করে, তাহার কোনটীর দ্বারাই যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব প্রমাণ করা যায় না, ইহাই দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত তিনটী সূত্রের (১৭, ১৮ ও ১৯) অবতারণা হইয়াছে। কিন্তু এই সূত্রগুলি সাধারণতঃ ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপই প্রযুক্ত হয়। সুতরাং এইগুলিকে খুব সাবধানে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

(১৭) "প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ", অর্থাৎ "এক নিত্য ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব (কর্তৃত্ব) বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই"। কিন্তু অনিরুদ্ধ, বিজ্ঞান ও মহাদেব, ইঁহারা সকলেই এই সূত্রটীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, অনাদ্যনন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। অনিরুদ্ধ বলিতেছেন—"প্রত্যক্ষপ্রমাণাভাবাৎ (ন তৎসিদ্ধিঃ)", অর্থাৎ "কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় শাশ্বত ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসিদ্ধ"। মহাদেব বলেন—"তৎসিদ্ধিঃ", অর্থাৎ "ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ"। কারণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অভাব সকলেরই সুবিদিত। বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাখ্যা করিতেছেন—"তৎসিদ্ধির্নিত্যেশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তীত্যনুমানশব্দাবেব প্রমাণে বক্তব্যে, তে চ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ", অর্থাৎ "'তৎসিদ্ধিঃ' অর্থাৎ নিত্যেশ্বরের প্রমাণ প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বর সম্বন্ধে অবশ্যই কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। সুতরাং অনুমান ও আগম প্রমাণই এখানে অবশ্য বিবক্ষিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু সে দুইটীই সম্ভব নহে। ইহাই তাৎপর্য্য।" পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার শেষ অংশটী ১৮শ ও ১৯শ সূত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। এখানে দেখা উচিত যে 'তৎ' অর্থে তাঁহারা এক নিত্যেশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিতেছেন। কিন্তু ইহা বস্তুতই উহার প্রকৃত অর্থ নহে। পূর্ব্বোক্ত সব সূত্রগুলিই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব (বা কারণত্ব) প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তি বিন্যস্ত হইয়াছে তাহাদের খণ্ডনেই এতক্ষণ ব্যাপৃত; কোথাও ঈশ্বরের নাস্তিত্বের প্রমাণে চেষ্টা হয় নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং ইহা কিরূপে সম্ভব যে তাহা অপ্রমাণ করিবার জন্য সূত্রকার হঠাৎ এইরূপ একটী সূত্রের অবতারণা করিলেন? ইহাতে যে কেবল সমস্ত যুক্তির ধারাটি (যাহা ৯ম সূত্র হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯শ সূত্রে শেষ হইতেছে) হঠাৎ মাঝখানে ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা নহে—কিন্তু ১৯ সূত্রের সহিত সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়া পড়ে, যে সূত্রটী স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছে যে শ্রুতি অনুসারে প্রকৃতিই জগতের কারণ, নিত্য ঈশ্বর নহেন; অর্থাৎ শ্রুতি ঈশ্বরের কারণত্বই অস্বীকার করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব নহে। এ বিষয়টী আমরা পরে দেখাইব। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বা অস্তিত্ব কোনটীই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমাণ অথবা অপ্রমাণ করা যায় না; কারণ, ঈশ্বর নিত্য ও অনাদ্যনন্ত, তিনি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না; সুতরাং ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ স্বতই এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণও করিতে পারে না অপ্রমাণও করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের ন্যায় তাঁহার কর্তৃত্বও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমাণও করা যায় না অপ্রমাণও করা যায় না। কারণ, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরূপে জানিতে পারি যে, ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা কি না? ঈশ্বর যদি নিত্য ও অনন্ত হন এবং কাজে কাজেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের অবিষয় হন, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার কর্তৃত্ব সম্বন্ধেও কোনওরূপ কথা বলা যাইতে পারে? সুতরাং এই সূত্রটী স্বতই অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং যথাস্থানে ও যথোপযুক্তরূপে ইহার সন্নিবেশ হয় না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সূত্রকার কর্ম্মের ফলদাতৃরূপে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব (বা কারণত্ব) অপ্রমাণ করিবার জন্য যে যুক্তিটীর অবতারণা করিয়াছেন, এই সূত্রটীর তাহার সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। এই কারণে আমার মনে হয় যে ইহার যথার্থ অর্থ হইতেছে এই যে, ইহাতে সূত্রকার প্রথমে সাধারণভাবে বলিতেছেন যে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের (বা কারণত্বের) কোনও প্রমাণ নাই এবং তাহার পর নিম্নলিখিত সূত্রগুলিতে অধিক স্পষ্টভাষায় বলিতেছেন যে, আরও যে দুইটী প্রমাণ (অনুমান ও আগম) এক্ষেত্রে খাটিতে পারে, তাহারও অভাব। পরবর্ত্তী সূত্র দুইটীর সহিত যুক্তির বাস্তবিকই সম্পর্ক আছে। সূত্রকার সেই সূত্রগুলি বলিতেছেন—

(১৮) "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্", অর্থাৎ "প্রকৃতির সহিত ঈশ্বরের কোনওরূপ সম্বন্ধের অভাব হেতু ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বা কারণত্ব সম্বন্ধে অনুমানও এখানে খাটিতে পারে না; অর্থাৎ ঈশ্বর গুণ-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, সুতরাং ফল-নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাঁহার সঙ্কল্পপূর্ব্বক কার্য্য করা অনুমান দ্বারাও সিদ্ধ হয় না"। অনিরুদ্ধ, বিজ্ঞান ও মহাদেব—এই তিনজন টীকাকারই 'সম্বন্ধ' শব্দের অর্থে 'ব্যাপ্তি' অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য যোগ বুঝেন এবং 'ব্যাপ্তিই' * অনুমানের একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। (ক্রমশঃ)

* ন্যায়ের পারিভাষিক শব্দ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যদি কেহ বলেন, প্রতাপসিংহের দুহিতা একজন মুসলমানকে ভালবাসিবে?—দেখুন কিরূপ অবস্থায় অশ্রুমতী মানুষ হইয়াছিল *—সে জানিত না—রাজপুত কে মুসলমান কে। যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল তাকেই সে ভালবাসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?"

এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অশ্রুমতীর নূতন সংস্করণে একটি ভূমিকায় এ সকল কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ১৩২১ সালে প্রকাশিত অশ্রুমতীর অষ্টম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিম্নোদ্ধৃত 'কৈফিয়ৎ' ভূমিকা-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাণা প্রতাপসিংহের অশ্রুমতী নাম্নী কোন কন্যা ছিল কি না এবং অশ্রুমতী ও সেলিমের মধ্যে বাস্তবিকই কোন প্রেমের ব্যাপার ঘটিয়াছিল কি না। ইহার উত্তরে আমার নিবেদন—

রাণা প্রতাপসিংহের একটি কন্যা আরাবল্লি পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ এক টিন খনির মধ্যে হারাইয়া যায় এবং তত্রত্য ভীলগণ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হয়। এইটুকুই ইহার ঐতিহাসিক কিম্বা কিংবদন্তীমূলক ভিত্তি। বাকী সমস্তই কপোলকল্পিত। 'অশ্রুমতী' নামও মৎ-প্রদত্ত। এইরূপ নিরাশ্রয় বালিকার সৈনিকদিগের কবলে পতিত হওয়া অসম্ভব ঘটনা নহে। তাহার পর সেলিম উহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, বিশ্বাস করিয়া সেলিমের প্রতি ঐ বিমুগ্ধা সরলা বালা যে কৃতজ্ঞ হইবে এবং সেলিমের যত্নাতিশয্যে এ কৃতজ্ঞতা যে ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হইবে, তাহাতেও আশ্চর্য্য নাই। ইহা মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণাম। বলা বাহুল্য, স্থলবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে মানবপ্রকৃতির কিরূপ বিকাশ ও পরিণাম ঘটে তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য কার্য্য। কোন মুসলমানের প্রতি হিন্দু ললনার অনুরাগের কথা শুনিয়া কেহ কেহ আঁৎকিয়া উঠেন। যেন এরূপ ঘটনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক, যেন এরূপ কেহ কখনও শুনে নাই, যেন ইতিপূর্ব্বে কোন উপন্যাসেই এরূপ ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। তবে যদি কেহ বলেন, রাণা প্রতাপসিংহের দুহিতাকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া রাণার শুভ্র যশকে কলঙ্কিত করা উচিত হয় নাই—তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য—যিনি অশ্রুমতী নাটক ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন, যাহাতে রাণা প্রতাপসিংহের শুভ্র যশ কলঙ্কিত না হয়, যাহাতে অশ্রুমতীর বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শ মাত্র না থাকে, সে বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও যত্নবান হইয়াছি। যথা—

"প্রতাপ। কি বল্লে শক্তসিংহ? আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয় নি?

শক্ত। আমি বিলক্ষণ জানি—আর তরবারি স্পর্শ করে বলতে পারি—সেলিম কর্ত্তৃক অশ্রুমতীর কোন অসম্ভ্রম হয় নি—শত্রু হলেও মুক্তকণ্ঠে আমার এ কথা স্বীকার করতে হবে। এ আপনাকে আমি শপথ করে বলছি—কোনও প্রকার কলঙ্ক অশ্রুমতীকে আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নি—আপনি সে বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন হোন।"

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া প্রতাপ সিংহ বিষপ্রয়োগের আদেশ রহিত করিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কঠোর যোগিনী-ব্রত পালনের আদেশ করিলেন।

"শক্তসিংহ—ওর মনেও যদি কলঙ্ক স্পর্শ করে থাকে—আমি সে কণামাত্র কলঙ্কও ওর বিবাহ দিয়ে কুলপরম্পরায় প্রবাহিত করতে চাই নে।"

অতএব দেখা যাইতেছে, এইরূপ আদেশ করিয়া রাণা প্রতাপসিংহ স্বকীয় শুভ্র যশকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এবং অশ্রুমতীর আচরণ হইতে ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে—অশ্রুমতীর স্বর্গীয় প্রেমে কোন পার্থিব কলঙ্কের স্পর্শমাত্র হয় নাই।

নিবেদক—

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কেহ কেহ অশ্রুমতীর 'হিন্দী সংস্করণ' প্রচার বন্ধ করিবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৬)

Bharat-Jiwan Office
Old Chowk
Benares City 29-10-1901

Ramkrishna Varma
Commisson Agent, Proprietor
and Publisher, Bharat Jiwan.

মান্যবর মহাশয়,

আমরা হিন্দী সাহিত্য সেবার নিমিত্ত প্রায় অন্যান্য ভাষা হইতে উত্তমোত্তম পুস্তকগুলির হিন্দী অনুবাদ করিয়া থাকি—অনেকগুলি পুস্তক এরূপ প্রকাশ করিয়াছি। আপনার রচিত "অশ্রুমতী" নাটক আমি নিজ খরচে ছাপাইয়াছিলাম, কিন্তু কতিপয় পত্রে উহার কুৎসা রটাইয়া আমাকে বাধিত করিল যে ভবিষ্যতে যেন আর

* "ভাগ্যি তোমরা তাকে জবরার টিনখনিতে লুকিয়ে রেখেছিলে।"

বিক্রয় না করি। তন্নিমিত্ত আমাকে প্রতুল অর্থহানি সহ্য করিতে হইয়াছে।

আপনার 'সরোজিনী নাটক' এক মহাশয় হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন—এ বহুদিনের কথা। বাজারে আর বই পাওয়া যায় না। এ নিমিত্ত আমি অনুবাদককে লিখিয়াছিলাম—উনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পুনঃ ছাপাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু আমার প্রার্থনা যে যদি মহাশয়ও আজ্ঞা প্রদান করেন তাহা হইলে আরও উত্তম হইবে; কারণ ইহা প্রকাশ হইলে আপনার কীর্ত্তি হিন্দী-সমাজেও প্রকাশিত হইবে। প্রতি-উত্তর একান্ত প্রার্থনীয়।

বশম্বদ

শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ম্মা।

পুনঃ

1 গাজীপুরের মোখত্যার লালা উদিত নারায়ণ লালকে আপনি 'অশ্রুমতী'র অনুবাদ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিজের খরচে ছাপাইয়াছিলাম।

2 'সরোজিনী'র প্রথম অনুবাদে অনেক ভাষার দোষ রহিয়াছে, এবারে তাহাও শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

রাম।

'অশ্রুমতী' লইয়া এই আন্দোলন আরও অনেকদিন চলিয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন :—

(৭)

195 Cornwallis Street
Nov. 30th. 1903.

সবিনয় নিবেদন,

আপনাকে অনেক দিন পত্র লিখি নাই, আপনার সহিত সাক্ষাৎও নাই। বোধ হয় ৺কৃপায় আপনার কায়িক কুশল আছে। এ পক্ষের সকল কুশল জানিবেন।

একটা কথা বলিবার আছে। গত কল্যকার তারিখের "রঙ্গালয়" পত্রে দুইটি প্যারা আছে, উহাতে বাঙ্গালী গ্রন্থকারের দায়িত্বের কথা তুলিয়া আপনার 'অশ্রুমতী'র কথাও লেখা আছে। ব্যাপার এই যে, 'রাজস্থান সমাচার' নামক হিন্দী কাগজে এবং সেই সঙ্গে 'বেঙ্কটেশ্বর সমাচার' প্রভৃতি অন্য সকল হিন্দী কাগজে আপনার 'অশ্রুমতীর' কথা ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন চলিতেছে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অশ্রুমতীর অনুবাদ হইয়া উহার অভিনয়ও চলিতেছে। এই অভিনয় কারণ লোকের মনে অনায়াসেই বাঙ্গালী বিদ্বেষ যেন দৃঢ়ীভূত হইতেছে। যে সকল হিন্দুস্থানী লেখক-বন্ধু বাঙ্গালীর পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বলিতেছেন যে, আপনি যদি সোজা মহারাণা উদয়পুরকে পত্র লিখিয়া ত্রুটি স্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্যতে নূতন সংস্করণ করিতে হইলে অশ্রুমতীর ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের আন্দোলনটা একেবারেই নিভিয়া যায়। উদয়পুরের বর্ত্তমান মহারাণা ফতেহ সিংহ বাহাদুর বড়ই যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি আপনার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইলে জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে শান্ত রাখিতে পারেন। রাজস্থানে একটা ক্ষত্রিয়-সভা হইয়াছে। এই সভার সদস্য 'রাজওয়াড়ার' সকল করদ নৃপতি; এই সভার প্রতাপও খুব। বাঙ্গালী-বিরোধের আন্দোলনটা এই সভাই গ্রহণ করিয়াছে। তাই আশু কুফল ফলিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা। রাজস্থানের বাঙ্গালী চাকুরেদের মধ্যেও এমন আশঙ্কা খুব হইয়াছে। আপনি বাঙ্গালীর শিরোমণি—বাঙ্গালী জাতির মঙ্গল কামনা আপনি করিয়া থাকেন, বাঙ্গালী জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে আপনি নানাবিধ ত্যাগস্বীকারও করিতে পারেন, বিশেষ, আমার আপনার উপর একটু আব্দার চলে; তাই সাহস করিয়া এত কথা লিখিতে পারিতেছি। সত্য বটে, নাটকের হিসাবে 'অশ্রুমতী'তে কোন দোষ নাই, সত্য বটে নাটককারের সকল দেশেই যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতার আপনি কোথাও অপব্যয় করেন নাই, তথাপি যখন একটা অছিলা ধরিয়া দুষ্ট হিন্দুস্থানী লেখকগণ বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিষম বিদ্বেষের উদ্গার করিতেছে, তখন একটু সাবধান হইলে, একটু নরম হইলে বাঙ্গালীরই পক্ষে শ্লাঘার কথা হইবে, জানিবেন। আমি শুনিলাম যে, পূর্ব্বে আপনি উদয়পুরের কোন এজেন্টের নিকট স্বীকার পাইয়াছিলেন যে, অশ্রুমতীর নূতন সংস্করণে আপনি ভাব বদলাইয়া দিবেন। বোধ হয়, হিন্দী বঙ্গবাসীতে ও ভারতমিত্রে এ কথা প্রকাশিতও হইয়াছিল। যদি আমার খবর ঠিক হয়, তাহা হইলে এমন অনুমান করা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে না যে, আপনি মহারাণা বাহাদুরের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া পত্র লিখিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। একখানি চিঠিতে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ভাষায় রাণা প্রতাপবংশাবতংস বর্ত্তমান মহারাণা ফতেহ সিংহ মহোদয়ের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতে বোধ হয় আপনার সঙ্কোচ বোধ হইবে না। বিশেষ যখন এইরূপ করিলে একটি প্রবল জাতি সম্প্রদায়ের amour propreর পুষ্টি হইবে এবং বাঙ্গালী জাতির সদ্ভাবের সূচনা করা হইবে, তখন আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সঙ্কোচ করিতেই পারেন না।

মহারাণা বাহাদুরকে সরাসরী আপনি পত্র লিখিলে

হয় ত তাঁহার হস্তগত না হইতে পারে। আপনি যদি ত্রুটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন ত' আমাকে বলিবেন, আমি যোগ্য লোকের দ্বারা আপনার পত্র 'খোলা দরবারে' মহারাণার হস্তগত করাইয়া দিতে পারিব ; এবং যাহাতে আপনার মর্য্যাদানুসারে রাণা-দরবার হইতে পত্রোত্তর ও অভিবাদন আপনার হস্তগত হয়, সে পক্ষেও যথেষ্ট চেষ্টা করিব। আপনি জানিবেন যে, ত্রুটি স্বীকার করিলে হিন্দুস্থানী সমাজে তথা মহারাণার দরবারে আপনার মান-সম্ভ্রমের বৃদ্ধিই পাইবে। আমি 'সাহিত্য-পরিষদের' সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছি। যদি বাঙ্গালী বুধমণ্ডলীর পক্ষ হইতেও এই ব্যাপার লইয়া মহারাণার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠা রাজস্থানে বাড়িয়াই যাইবে।

আমার পত্রের উত্তর দিবেন। যদি প্রয়োজন মনে করেন ত আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিতে পারি। অনেকদিন দেখা শুনা নাই, একবার দেখা করিলেও কোন অ-লাভ নাই। ইতি ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩১০।

অনুগত

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাগজ-পত্রাদির মধ্যে উপরি-উদ্ধৃত পত্রের নির্দ্দেশমত উদয়পুরের মহারাণাকে লিখিত একখানি পত্রের খসড়া পাওয়া গিয়াছে। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

19 Store Rd., Baligunj.

To

H. H. the Maharana of Oodeypore

etc. etc.

Your Highness,

It has been brought to my notice lately that a certain Bengali drama of mine called "Ashrumati," which was published by me about 25 years ago, has had the misfortune to incur the displeasure of a section of the Rajput community, on account of an imaginary love-episode introduced by me between Ashrumati, a fictitious daughter of Rana Pratap Singh and Selim, son of Akbar.

I beg to be allowed to tell you, who are the head of the Rajputs, and the one who can claim to be most interested in the matter,—that nothing could have been further from my thoughts than to cast the slightest slur on the illustrious fame of Pratap Singh, the hero of the whole of Hindustan. On the other hand, I have endeavoured in my drama to portray his charactr in all its greatness and nobility.

The episode alluded to is slight enough in itself as your Highness may see for yourself if you deign to glance over the book, and is also purely imaginary. Nevertheless, if I have, however unwittingly hurt the feelings of the Kshatriya community of India in any way,—all I can say is that I am exceedingly sorry—and that I am willing to do all that is possible for me so remove any misconception there may exist in this connection.

I have the honor to be

Your most obdt. Servant

পত্রখানি মহারাণার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল কি না এবং যদি হইয়া থাকে উহার কি প্রত্যুত্তর আসিয়াছিল, আমরা তাহা অবগত হইতে পারি নাই।

সুধীশ্রেষ্ঠ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'অশ্রুমতী' পাঠ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা অশ্রুমতী-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আপনার 'অশ্রুমতী' পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। 'সরোজিনী'র ন্যায় ইহাতেও ভাষার সরলতা ও মধুরতা এবং গল্পের রচনা-নৈপুণ্য প্রচুর পরিমাণে আছে। ইহাতে চিত্রিত চরিত্রগুলির স্ব-স্ব দোষগুণ সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতাপসিংহের বীরোচিত স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও স্বদেশানুরাগ, শক্তসিংহের ভ্রাতৃভক্তি, সেলিমের উদারতা ও ভীলজাতির সরলতা অতি উজ্জ্বলরূপে রঞ্জিত হইয়াছে। সরলভাবে বলিতে গেলে পৃথ্বীরাজের চরিত্রটি আমার তত ভাল লাগে নাই। তিনি কবি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু এত প্রণয়ে চপলতা ও মলিনার প্রতি এরূপ কর্কশ ব্যবহার কবির যোগ্য কোন মতেই হয় নাই। প্রতাপ সিংহের কন্যা হইয়া 'অশ্রুমতীর' যবনের প্রতি প্রণয় হওয়া কতদূর যথাযোগ্য হইয়াছে তদ্বিষয়ে মতামত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জীবনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত মনে রাখিলে বিরুদ্ধ মতের অনেকটা খণ্ডন হইবে। তাঁহার শেষ সঙ্গীতটি অতি মনোহর হইয়াছে। যদিও তাহার ভিতর বাসনার আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায় এবং সেটা যোগিনীর স্বভাবোচিত হয় নাই, কিন্তু তিনি কি অবস্থায় যোগিনীব্রতে দীক্ষিত হন তাহা স্মরণ রাখিলে এ দোষের অনেক লাঘব দেখা যাইবে। এ অভাসটুকু না থাকিলে তাঁহাকে দেবী বলিতাম, থাকা সত্ত্বেও নিষ্কলঙ্ক হতভাগিনী মানবী বলিয়া অশ্রুমতীর জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকা যায় না।"

বেদগান।

ভৈরবী—পটতাল।

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১´ • ১´ • ১´
সা -া II দাঃ -পঃ। পাঃ -মঃ I পা -ণা। -দাঃ -পঃ I পা -া।
ওঁ • যো • দে • • বো • • গ্ নৌ •

• ১´ • ১´ • ১´
। মা -জ্ঞরা I জ্ঞা -া। ঋা -সা I ণ্দা -ণ্া। ণ্ঃ -সাঃ I সঋা জ্ঞমা।
যো • প্ সু • যো • বি • • শ্ব ম্ ভু ব ন মা

• ১´ •
। -া জ্ঞজ্ঞা I -ঋজ্ঞঋা -ঋা। সা -া II
• বি বে • • • • শ •

১´ • ১´ • ১´ •
II দঃ দা দঃ। দা -ণদা I ণা র্সা। ঃ র্সঃ র্সা I ঃ র্সঃ র্ঋণা। -র্সঃ র্সাঃ I
য ও ষ ধি • • ষু যো ব ন স্প তি • • ষু

১´ • ১´ • ১´ •
I র্জ্ঞাঃ -র্ঋঃ। র্জ্ঞাঃ -র্ঋঃ I র্জ্ঞাঃ -র্ঋঃ। র্মা -র্জ্ঞা। -া র্ঋর্ঋা। র্ঋা -র্সর্ঋর্জ্ঞা I
ত • স্মৈ • দে • বা • • য় ন মো • • •

১´ • ১´ • ১´ •
I র্ঋর্ঋা র্সা। -া -া I দা -র্সণা। র্সা -া I র্সা -া। র্ঋঃ -ণাঃ I
ন ম হ • • ত • • স্মৈ • দে • বা •

১´ • ১´ • ১´ •
I দদা দা। -পদণা -দা I পপা পা। -া -া I জ্ঞা -পমা। পা -া I
য় ন মো • • • • ন ম হ • • ত • • স্মৈ •

১´ • ১´ • ১´ •
I পাঃ -মঃ। পঃ -ণাঃ I -দাঃ -পঃ। জ্ঞঃ জ্ঞা -সঃ I -জ্ঞঃ -ঋা সঃ। সসা -া II II
দে • বা • • য় ন মো • • • ন ম • হ

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

অগ্নির অগ্নি হয়ে বিরাজেন সদা যিনি।
জলেতে স্নেহরূপে আছেন পশিয়া যিনি॥
ওষধি বনস্পতি সবার দেবতা যিনি।
তাঁহারে ভক্তিভরে নমি—নমি—সদা নমি॥

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II { সা -দা। পা পা পা। -া পা। পা পা -া I পা পমা। পা -ণা ণা।
অ ০ গ্নি র অ ০ গ্নি হ য়ে ০ বি রা০ জে ০ ন

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। দা দপা। মপা -া মা I জ্ঞা রা। জ্ঞা -া মা। জ্ঞা -া। ঋা -া সা I
স দা০ যি ০ নি জ লে তে ০ স্নে হ ০ রূ ০ পে

২ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা দ্‌া। ণ্‌া -সা জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা। ঋা -া সা } I দা দা। দা -ণদা ণা।
আ ছে ন ০ প শি য়া যি ০ নি ও ষ ধি ০০ ব

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা -া। র্ঋণা -র্সা -র্সা I র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা। র্জ্ঞা -া র্মা। র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্ঋা -া র্সা I
ন ০ স্প ০ ০ তি স বা০ র ০ দে ব তা যি ০ নি

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I র্সা র্সা। র্ঋা -র্সা ণা। -া ণা। ণা দা -পা I জ্ঞা পা। দা -া পা। মা মা।
তাঁ হা রে ০ ভ ০ ক্তি ভ রে ০ ন মি ন ০ মি স দা

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
I মা -া মা I জ্ঞা রা। জ্ঞা -া মা। জ্ঞা জ্ঞা। ঋা -া সা I সা দ্‌া।
ন ০ মি ন মি ন ০ মি স দা ন ০ মি ন মি

৩ ০ ১
। ণ্‌া -সা জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা। ঋা -া সা II II
ন ০ মি স দা ন ০ মি

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

মিশ্র বেহাগ—দাদরা।

আপনি যখন হৃদয়ে ফুল ফুটিবে না—তুমি এসো।
শুষ্ক যখন জীবনে গীত উঠবে না—তুমি এসো।
জীবন যখন হবে মরু, রইবে না তায় একটী তরু
(যখন) অন্ধ কারা ঠেকবে ধরা—তুমি এসো।
কান্না যখন বক্ষে আমার বন্যা ব'বে—তুমি এসো।
বিফল যখন লাগবে জীবন মাগবে মরণ—তুমি এসো।
নিমেষে ফুল ফুটিও তবে, সুধার উৎস ছুটিও তবে
(আমার) কান্নাজলে পান্নাদোলায় তুমি এসো।
তুমি আমার জীবনে কি—কইতে আমি পারি সে কি ?
সব গীতি যে বন্ধ সেথায়—সকল কথা কথার ফাঁকি।
তুমি আমার জীবনে কি—আমি বিনে জানবে কে কি ?
(তোমার) চরণতলে সব বিকানু—তুমি এসো।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

১´ . ১´ . ১´
II সা -া পা। পা পা -জ্ঞা I গা গা -মা। গা গরা -সা I সা -রা সরা।
আ প্ নি য থ ন্ হৃ দ • য়ে ফু• ল্ ফু ট্ বে•

. ১´ . ১´ .
। -গমা গা -া I ন্া ন্া -সা। সা সা -া I সা -া রা। রা রা -া I
•• না • তু মি • এ স • শু ষ্ ক য থ ন্

১´ . ১´ . ১´
I গা গরা -সন্া। ন্া সা -া I সা -রা সরা। -গমা গা -া I ন্া ন্া -সা।
জী ব• •• নে গী ত উ ঠ্ বে• •• না • তু মি •

.
। সা সা -া II
এ স •

১´ . ১´ . ১´
II {পা পা -া। না না -া I র্সা র্রা -র্গর্রা। র্সনা র্সা -া I র্সা -র্গা র্রা।
জী ব ন্ য থ ন্ হ বে •• ম রু • রই • বে

. ১´ . . ১´ .
[পা না না। ধা না -া I
। র্মা র্মা -া I র্গা -া র্গর্রর্সা। না র্সা -া} I পপা I {র্সা -া র্সা। র্সা র্সা -পা I
না তা য় এ ক্ টি•• ত রু • যখন্ অ ন্ ধ কা রা •

১´ . ১´ .
পা ধা পা]
I পা -া পা। মা গা -া I রা রগা -মপা। মা গা -া} II
ঠে ক্ বে ধ রা • তু মি• •• এ স •

১´ . ১´ . ১´
[সা -া রা। রা রা -া I রা -া রা। গা রসা ন্া I সা -া রা।
II {গা -া রা। সা সা -া I সা -া সা। সা সা -ন্া I ধ্া -া ন্া।
কা ন্ না য থ ন্ ব • ক্ষে আ মা র্ ব • ন্যা

. ১´ . ১´ .
। সরা -গমা -পমা গা -া -া]
। ধন্া -সরা -া I সা -া -া। -া -া -া I পা পা -জ্ঞগা। গমা গা -া I
ব• •• • বে • • • • • তু মি •• এ স •

১´ . ১´ . ১´
I জ্ঞা জ্ঞা -া। জ্ঞা জ্ঞা -া I পা -া জ্ঞগরা। রা রা -া I গঃ -জ্ঞাঃ পা।
বি ফ ল্ য থ ন্ লা গ্ বে•• জী ব ন্ মা গ্ বে

. ১´ . ১´ .
। গজ্ঞা -পধা -া I পা -া -া। -া -া -া I পা পা -জ্ঞগা। গমা গা -া} II
ম• •• • রণ • • • • • তু মি •• এ স •

১´ ০ ১´ ০ ১´
II { পা গা -া। পা ধা -াপ I র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা -া I র্সা র্গা র্রা।
নি মে ০ যে ফু ল্ ফু টি য়ো ত বে ০ সু ধা র্

০ ১´ ০ ১´ ০
[পা -না না। ধা না -া]
। র্গর্মা -া র্মা I র্গা র্গা র্রর্সা। না র্সা -া } I পপা I পর্সা -া র্সা। র্সা র্সা -াপ I
উং ০ স ছু টি য়ো০ ত বে ০ আমার কা ন্ না জ লে ০

১´ ০ ১´ ০
[পা -ধা পা]
I পা -া পা। মা গা -া I রা রগা -মপা। মা গা -া II
পা ০ য়া দো লা য়্ তু মি০ ০০ এ স ০

১´ ০ ১´ ০ ১´
II গা রা -া। সা ন্ধা -পা I সা সা ন্রা। সা সা -া I সা -া রা।
তু মি ০ আ মা০ র্ জী ব ০০ নে কি ০ ক ই তে

০ ১´ ০ ১´ ০
। রা রা -গা I সা সরা -গা। গা গা -া I ক্মা -া ক্মা। ক্মা পক্মা -গরা I
আ মি ০ পা রি০ ০ সে কি ০ স ব্ ০ গী তি যে০ ০০

১´ ০ ১´ ০ ১´
I গক্মা -পধা ধা। ধা পা -া I গা গা -মা। গা গরসা -া I গরা সরা -গা।
ব০ ০ন্ ধ সে থা য় স ক ল্ ক থা০০ ০ ক থা০ র্

০
। গা গা -া II
কাঁ কি ৯

১´ ০ ১´ ০ ১´
II { পা গা -া। পা ধা -াপ I র্সা র্সা -ন্র্রা। র্সা র্সা -া I র্সা র্গাঃ -র্রঃ।
তু মি ০ আ মা র্ জী ব ০০ নে কি ০ আ মি ০

০ ১´ ০ ১´ ০
[পা পা না। ধা না -া I]
। র্মা র্মা -া। র্গা -া র্রর্সা। না র্সা -া } I পপা I র্সা র্সা -া। র্সা র্সা -াপ I
বি নে ০ জা ন্ বে০ কে কি ০ তোমার্ চ র ণ্ ত লে ০

১´ ০ ১´ ০
পা ধা পা]
I পা -া পা। মা গা -া। রা রগা -মপা। মা গা -া II II
স র্ বি কা য় ০ তু মি০ ০০ এ স ০

সিমলা পাহাড়ে সিপির মেলা।

(শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু)

"মশত্রা" সিমলা পাহাড়ের সন্নিহিত একটী পল্লী। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ব্যারাকপুর নামক সহরের মত এই স্থানে বড় লাট মহোদয়ের এক রমণীয় বিনোদাশ্রম আছে। সপ্তাহান্তে তিনি সপরিবারে সেখানে বিশ্রামোদ্দেশে যাইয়া থাকেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে এই 'মশত্রা'র প্রায় দুই মাইল নিম্নে, পাহাড়ের তলদেশে 'সিপির মেলা' হয়।

বৈশাখ মাস গত হইয়াছে। বাংলা দেশের ন্যায় এই পার্ব্বত্য প্রদেশেও নৈদাঘ ভানুর কিরণ কোন অংশে বঙ্গদেশ অপেক্ষা কম উষ্ণ নহে।

দু-তিন দিন ধরিয়া লোকমুখে সিপির মেলার আড়ম্বরের কথা শুনা যায়। কয়েকজন বন্ধু সিপির মেলাতে যাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। বেলা ১২টার সময় 'ঠাণ্ডি সড়কের' (the mall) নিকটস্থ 'গির্জ্জা ময়দানে' জমায়েৎ হইবার কথা ঠিক হইল। সেখান হইতে পদব্রজে অথবা রিক্‌শবাহনে মেলার উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইবে। মেলার দিন প্রাতঃকাল হইতে তাড়াতাড়ি করিয়া সাংসারিক কাজ সমাপনপূর্ব্বক বেলা ১০॥টার মধ্যে নাকে মুখে কিছু অন্নব্যঞ্জন গলাধঃকরণ করিয়া কথামত গির্জ্জাময়দানের সম্মুখে হাজির হওয়া গেল। বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ কেহ সেই সময়ে উক্ত স্থানে হাজির ছিলেন। বাঙ্গালীর সময়নির্দ্দেশের (appointment) উনিশ-বিশ হইয়াই থাকে; কাজেই কেহ বা ৫ মিনিট পূর্ব্বে, কেহ বা ১০ মিনিট পরে চড়াই ভাঙ্গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাজির হইলেন। সেখান হইতে quick march করিতে প্রায় ১২টা ৪০ মিনিট হইল।

এবৎসর গ্রীষ্মের খরতর প্রভাব সর্ব্বত্র অত্যন্ত বেশী। সিমলার শৈলশিখরে অনাবৃষ্টি হেতু রৌদ্রের কিরণ সাতিশয় প্রবল অনুভূত হইল। সেই মধ্যাহ্নরবি মস্তকে করিয়া জনস্রোত চলিতেছে—কেহ পদব্রজে, কেহ ঘোটক-পৃষ্ঠে, কেহ বা রিক্‌শযানে সিমলা-শৈলের নানাস্থান হইতে উৎসাহ সহকারে মেলাদর্শনার্থ 'সন্‌জনী'র পথ ধরিয়া মশত্রার পথে ধাবিত হইতেছে। সাহেব-মেম, শিখ, জৈন, খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ী, স্ত্রীপুরুষ সকলেই সিপির মেলাতে যাইবার জন্য ব্যস্ত। সন্‌জনী হইতে মশত্রার পথ লোকে-লোকারণ্য। এই মেলা সন্দর্শনের জন্য সাহেব-মেমদিগের উৎসাহও কিছু কম নহে। শুনিয়াছি, 'কোটীর' মহারাণার নিমন্ত্রণে কখন কখন স্বয়ং বড়লাট-বাহাদুর উপস্থিত থাকিয়া মেলার গৌরব বর্দ্ধন করেন। রিক্‌শওয়ালাদের আজ পয়সা রোজগারের মাহেন্দ্রযোগ। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা রিক্‌শভাড়া চারিগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ পদব্রজে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা এতটা পথ পদব্রজে চলিতে অক্ষম, তাঁহারা রিক্‌শওয়ালার সহিত অনেক বকাবকির পর একটী সামঞ্জস্য করিয়া দু'খানি রিক্‌শযানে চড়িলেন। এই যানে গ্রীষ্মের প্রখর রবির কিরণ হইতে কতকটা এড়ান গেল বটে, কিন্তু পথে কয়েকটা পবননন্দনের উৎপাতে ও উষ্ণ বায়ু-সঞ্চালনে সমস্ত অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়া বিনা পয়সায় দেশী 'পাউডার' মাথার কাজ করিল।

দু'জনে একখানি রিক্‌শবাহনে চলিতেছি। রিক্‌শওয়ালা পুনর্ব্বার ভাড়া খাটিবার উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। প্রায় ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "মশত্রা"র সীমা দেখা দিল। 'গেবল্‌স হোটেল' পার হইয়া রিক্‌শযান হইতে অবতরণ করা গেল।

এইবার পর্ব্বতের নিম্নদেশে অবতরণ করিতে লাগিলাম। যতই নামা যায়, ততই পথ আর ফুরায় না। নীচে নামিতে নামিতে পায়ে ব্যথা বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু মেলা-সন্দর্শনের উৎসাহ কিছুতেই কমিল না। প্রায় দেড় মাইল পথ পাহাড়ের নিম্নদেশে অবতরণ করিয়া আমরা শৈলের প্রান্তদেশে একেবারে যেন পাতালপুরীতে উপস্থিত হইলাম। মধ্যপথ হইতে দামামা ও বাঁশরী প্রভৃতির মধুর ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। মেলার স্থান পর্ব্বতের সানুদেশস্থ এক নাতিপ্রশস্ত প্রান্তরে নির্দ্দিষ্ট হইছিল। যখন মেলাক্ষেত্রে পৌঁছান গেল, তখন বেলা ২॥টা বাজিয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে তনু দগ্ধপ্রায়। দেড় মাইল পথ উৎরাই ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আমরা একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ১৫ মিনিটকাল সমতল ভূমিতে বিশ্রামের পর আবার আমরা নবোদ্যমে মেলাক্ষেত্রের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিতে যাত্রা করিলাম।

অবতরণ কালে, পথে কোটীরাজেশ্বরের দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল। তখন তিনি মেলাক্ষেত্র হইতে পারিষদবর্গ সহ উপরে ফিরিতেছিলেন। যেস্থানে মেলা হয়, উহা কোটীরাজের অধিকারভুক্ত। 'কোটীর' মহারাণা আমাদের মত ইংরাজরাজের প্রজা নহেন, অপরাপর মিত্ররাজের মত তিনি ইংরাজবাহাদুরের বন্ধু ও রাজপুতবংশীয় পাহাড়ী করদ রাজা। পাটনা নগরে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি নিবাস। ইতিহাসে কথিত আছে যে, সিপাহিবিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা নিবন্ধন ইঁহারা 'রাণা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই মেলাক্ষেত্রের সন্নিকটে এক কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দিরে কোটিরাজের কৌলিক ইষ্টদেবতার প্রতিমা আছে। ইহা-

রই বাৎসরিক পূজা ও উৎসবোপলক্ষে এই মেলার আয়োজন হয়। মন্দিরটী কাষ্ঠনির্ম্মিত ও পাহাড়ী ধরণের; বাংলাদেশের দেবমন্দিরের গঠন যেরূপ ইহা তদ্রূপ নহে। মন্দিরটী সম-চতুষ্কোণ এবং উহার জানালা দরজা সমস্তই কাঠের প্রস্তত। ছাদটী কেবল করগেট্ লৌহনির্ম্মিত ও উহার উপরিভাগে কষ্ঠের আচ্ছাদন। লাল রঙ্গে মন্দিরটী রং করা হইয়াছে। দেখিতে অনেকটা 'প্যাগোডার' মত বোধ হইল। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দর্শন করিলাম। কিন্তু চর্ম্মচক্ষে একটী রক্তবর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদিত ধাতুমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য হইল না। মূর্ত্তিটীর সর্ব্বাঙ্গ সিন্দূরলেপিত। বন্ধুবর্গ ভক্তিসহকারে দেবীকে প্রণাম করিয়া নিকটস্থ প্রান্তরে পাহাড়ীদের নৃত্য-দর্শনে ছুটিলেন। কতিপয় পাহাড়ী মিলিয়া বংশীসংযোগে গীত গাহিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিয়া আমোদ করিতেছে। আমাদের দেশের সাপুড়ের বাঁশীর মত এই বংশীধ্বনি অতি শ্রুতিমধুর লাগিল।

ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র মেলায় যে ভাব, এখানেও কতকটা সেই প্রকার। স্থানে স্থানে 'দোলনার' আমোদ লাগিয়াছে। কোথাও বা নানা রংয়ের বসনপরিহিতা পাহাড়ী রমণীরা দোলনায় চড়িয়া ঘুরিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে অপর স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া হাসিতে হাসিতে দোল দিতেছে। আমাদের কয়েক জন বন্ধু এই দোলনাতে দুলিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু আমরা ঐ আমোদ হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাসনা প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া আমোদ পাইলাম ও ফিরিবার সময় দোলনেশ্বর-দেবতাকে প্রণাম করিয়া ফিরিলাম।

মেলার শোভাবৃদ্ধি করিবার জন্য স্থানে স্থানে দু-একটী হাতী সজ্জিত হইয়া ও পৃষ্ঠে সওয়ার লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; এবং মাঝে মাঝে শুণ্ডের আন্দোলনে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

কোথাও বা পাহাড়ীরা বেতের নির্ম্মিত 'টুকরী' বেচিতেছে। আমরা দু'একটী আবশ্যকমত কিনিয়া মেলার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিলাম। মেলাতে রম্ভা, আপেল, নাসপাতি প্রভৃতি মেওয়া অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিয়া পাহাড়ীরা ছয় মাসের লাভ এক দিনে উপার্জ্জন করিবার আয়োজন করিয়াছে।

যাঁহারা সোডা লেমনেড্ প্রভৃতি বিলাতী পানীয় খুঁজিতেছিলেন, তাঁহারা উহা পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। আমরা 'বাউড়ীর' শীতল জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম ও সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবানের চরণে বার বার প্রণতি জানাইলাম।

সিমলাশৈলের নানা জাতীয় লোকের একত্র সমাবেশে মেলাক্ষেত্র একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। জনকলরবে মেদিনী কম্পিতা, ঘোটকের ক্ষুরাঘাতে ধূলিকণায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণে প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে। আবার প্রায় দুই মাইল চড়াই ঠেলিয়া উপরে উঠিতে হইবে এই ভাবনায় বড়ই আতঙ্কিত হইলাম। তখনও মেলার সর্ব্বত্র দর্শন শেষ হয় নাই। বন্ধুদের মধ্যে পঞ্জাব-প্রদেশীয় যুবকগণ নব-উদ্যমে উৎপ্রাণিত—পাহাড়-পথের চড়াই-উৎরাইয়ে তাঁহাদের কোন কষ্ট নাই। ফিরিবার সংকল্প করিতেছি, এমন সময়ে একস্থানে আমাদের দৃষ্টি সহসা আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, মেলাক্ষেত্রের একধারে এক ছোট পাহাড়ের অগ্রভাগ পাহাড়ী রমণীতে পরিপূর্ণ। বালক-বালিকার সংখ্যা কিছু কম। যুবতী ও প্রৌঢ়ার সংখ্যাই অধিক। সুন্দরী রমণীরা সারি সারি পাহাড়ের গায়ে উপবিষ্টা হইয়া উহার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছেন।

বেলা অবসান প্রায়। সন্ধ্যাসমাগমে সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া আমরা জনস্রোত ভেদ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিবার জন্য আবার ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাম। পথে সাহেব-মেমের ঘোটকের ক্ষুরের ধূলিকণায় মেদিনী পরিপূর্ণ হইল। রিক্শ-বাহকদিগের "বাচ্চো" "বাচ্চে" (পথ ছাড়ুন) রব শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইল। শ্রান্তদেহে মেলার আমোদ উপভোগ করিয়া আবার 'সেবয়স্ হোটেলের' সম্মুখে আসিয়া রিকশ-বাহনে রাত্রি ৮টার সময়ে গৃহে উপনীত হইলাম।

নিবেদন।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

শীত-গ্রীষ্মাদি স্বাভাবিক ঋতুপর্য্যায়ে সম্বৎসরকাল বিভক্ত থাকিলেও, শুক্ল-কৃষ্ণ এই পক্ষদ্বয়ে প্রতিমাস বিখণ্ডিত হইলেও, ততদিন পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ সভ্যতা তেমন করিয়া উদ্ভাসিত হইতে পারে নাই, যে পর্য্যন্ত না অসীম অনন্ত কাল, সম্বৎগণনায় সালে-মাসে-বারে ও তিথিতে বিভক্ত হইতে পারিয়াছে। সৃষ্টিরচনায় কত অগণিত শতাব্দী পূর্ব্বে কালের আরম্ভ হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? প্রকৃত পক্ষে কালের আদিও নাই অন্তও নাই। সৃষ্টি এক সময়ে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—তাহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে না; কিন্তু কাল অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকিবে, কে তাহার গতিবেগ রুদ্ধ করিতে পারে?

* খিদিরপুর 'সারস্বত সম্মিলনের' ষোড়শ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে লিখিত ও অন্য কর্তৃক পঠিত।

কালের উপরে কখন কোন ছেদ পড়িতে পারে না। কিন্তু মানব আপন দৃপ্ত অহঙ্কার লইয়া এই অণ্ডহান মহাকালের গাত্রেও দাগ পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সে আপনার ক্ষুদ্র মাপকাঠী লইয়া শতাব্দী, সম্বৎসর, মাস, পক্ষ, বার, তিথির গণনা আরম্ভ করিয়াছে। সুদূর অতীতকে পরিহার করিয়া বর্ত্তমান হইতে তাহার গণনার আরম্ভ এবং ভবিষ্যতের দিকে উহার গতি। এবংবিধ গণনার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাস সংরক্ষিত হইতে পারিয়াছে। বিবিধ ক্ষেত্রে বিবিধ আবিষ্কার ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারিয়াছে। সর্ব্ববিধ উন্নতির ক্রমিক কাহিনী স্তরে স্তরে গ্রন্থের ভিতরে স্থানলাভ করিয়াছে। দেবদেবীর পূজার্চ্চনা যথাকালে সুসম্পন্ন হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঈদৃশ অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে।

কখন কখন মনে হয়, মানবের একি ভীষণ অহঙ্কার; অসীম অনন্ত কালকে সংখ্যাদ্বারা স্পর্শ করিতে চায়, তাহার গুরুত্বকে খর্ব্ব করিতে চায়! কিন্তু পরক্ষণেই যখন আবার সভ্যতা ও শিক্ষাসম্ভারের ক্রমিক বিকাশের দিকে, ইতিহাসের দিকে, বিভিন্ন রাজগণের বিভিন্ন সময়ে উত্থানপতনের দিকে, ধর্ম্মের ধারাবাহিক পরিণতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, পরস্পরের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধের আলোচনা করি, তখন সুস্পষ্টই প্রতীতি হয় যে এই কালগণনা কি সুমহান সুবিধার যুগ ধরাপৃষ্ঠে আনয়ন করিয়া দিয়াছে। এই শতাব্দী বা বর্ষগণনা সূচিত হইতে পারিয়াছিল বলিয়া সুদূর অতীত আজ আমাদের চক্ষে অস্পষ্ট ধূমাবৃত নহে; উহা বর্ত্তমানের মত প্রায় সমানভাবে ভাস্বর। আমাদের দুর্গতিকলে এদেশের যে সমস্ত ঘটনা শতাব্দীগণনায় সহিত যোগযুক্ত হইতে পারে নাই, অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদের আকুল অনুসন্ধানে তাম্রশাসন ও প্রাচীন মুদ্রার আবিষ্কার প্রভৃতি তাহাদের যথাযথ স্থান ইতিহাসের ভিতরে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে; এইরূপে অতীতের ও বিস্মরণের তমোময় আবরণ বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। বাগ্‌দেবীর কৃপা ভিন্ন এ সব কিছুই সংসিদ্ধ হইতে পারিত না।

এ দেশে বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা প্রকৃত প্রস্তাবে সেইদিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, যে দিন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের হৃদয় হইতে বৈদিক ও ঔপনিষদ সত্যরাজি অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের রচিত সামগানে আর্য্যাবর্ত্তের গহন কানন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর কত বেদান্ত, কত পুরাণ-তন্ত্র সুরচিত হইল, এই সমস্তই দেবীর মঙ্গল আশীর্ব্বাদে। আজ আমরা এখানে যে সমবেত হইতে পারিয়াছি, ইহাও তাঁহার মধুর আহ্বানে।

কেবলমাত্র এ দেশেই যে দেবীর আরাধনা চলিয়া আসিয়াছে তাহা নহে, সুদূর প্রতীচ্যেও এই কাব্য-সাহিত্য-শিল্প-বাণিজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সাধনা চলিয়াছে; ফলে জাগতিক ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে, রূপলাবণ্যে ও বিলাস-বিভ্রমে সমগ্র ইউরোপ আজ ধন্য হইয়া গিয়াছে। এ দেশের আদর্শ, এ দেশের লক্ষ্য কিন্তু অন্য দিকে চলিয়াছিল; তাই বিপুল আধ্যাত্মিক সম্পদলাভে সকলের উপর এই দরিদ্র ভারতই মস্তক উত্তোলন করিতে পারিয়াছিল।

বাগ্‌দেবীর আরাধনা কেবলমাত্র অদ্যকার দিনের জন্য নহে; এ যে জীবনব্যাপী সাধনা, এ সাধনার বিসর্জ্জন নাই—কেবলই যে আবাহন। এই অফুরন্ত সাধনায় আপনাকে নিমজ্জিত করিতে হইবে, তবেই সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমান যুগে চারিদিক হইতে আহ্বান আসিতেছে সমুত্থিত হইবার জন্য—জাগ্রত হইবার জন্য। বধির ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। চারিদিক হইতে বিদ্যুৎকণা আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিতেছে। নূতন জ্ঞানে নূতন আলোকে স্নাত হইবার জন্য সে মধুর আহ্বান। কেবলমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর। একদিকে দেবকৃপা, আর অন্যদিকে নিজ শক্তির নিজ জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ; এই উভয়ের যখন যুগপৎ মিলন হইবে তখনই দেশব্যাপী পূর্ণ সৌভাগ্য অবতীর্ণ হইবে।

চিত্তরূপ আধারকে নির্ম্মল কর, কৃপাময়ী দেবীর কৃপালাভ করিবার উপযুক্ত কর। অন্তরের ঘনান্ধকার বিদূরিত করিয়া সেখানে তাঁহার সিংহাসন চিরপ্রতিষ্ঠিত কর। আধার গুণেই জ্ঞান সফল হইবে, শিল্প সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে। বাহির হইতে জ্ঞানের আলোকের সম্পাত যতই কেন সামান্য হউক না, তোমার ক্ষেত্র নির্ম্মল ও উর্ব্বর হইলে তোমার সাধনা ও অধ্যবসায় গুণে বটবৃক্ষের বীজকণার ন্যায় তোমার জ্ঞান তোমার নৈপুণ্য বিস্ময়জনক সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। স্মরণে রাখিও, আমাদের মুখনিঃসৃত ফুৎকারের কোন মূল্য নাই; কিন্তু ঐ ফুৎকার যখন বংশীর রন্ধ্রে প্রবেশ করে, আধারগুণে তাহার ভিতর হইতে সুমিষ্ট রাগরাগিণী বাহির হইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিমোহিত করে। আমাদের অঙ্গুলিতাড়নের কোন মূল্য নাই; কিন্তু বীণার তার যখন তাহা স্পর্শ করে, আধারগুণে তাহার ঝঙ্কার অন্তরকে স্পন্দিত করে। আমাদের হাতের তালির কোন মূল্য নাই; কিন্তু যখন মৃদঙ্গের উভয়দিকে সেই তালির মৃদু আঘাত পড়িতে থাকে, তাহার মন্দ-মধুর নির্ঘোষে সভাস্থল স্তব্ধ হইয়া যায়। মৃণাল পঙ্ক হইতে রস আকর্ষণ করিয়া নিজ অসাধারণ শক্তিতে তাহার প্রান্তে কোরক রচনা করে; প্রতীক্ষা করিতে থাকে প্রাভাতিক সূর্য্যের আলোকরশ্মির এককণা লাভ করিবার জন্য। যখনই ঐ

আলোক প্রতিফলিত হয়, আধারগুণে পদ্ম বিকশিত হইয়া সরোবরকে হাস্যময় করিয়া তোলে। দেবীর নামে আজ মিলিত হইয়াছ, এই শুভ মুহূর্ত্তে বলদৃপ্ত আত্মত্যাগী 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের' কথা স্মরণ কর, অগ্নিবর্ষী অমিত-তেজা 'মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথের' কর্ম্মজীবনের কথা আজ একবার আলোচনা কর। তাঁহারা আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যে জ্বলন্ত আলোকচ্ছটা পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন, সেই অংশুমালার কণা যাহাতে আমাদেরও অন্তরে প্রতিফলিত হয় এবং আমাদিগকে ত্যাগে ও কর্ম্মে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে, করজোড়ে সম্মিলিত কণ্ঠে আজ তাঁহার নিকট এই বর ভিক্ষা কর; আমাদের এই সম্মিলন সার্থক হউক।

জাতিগঠনে সঙ্গীত।

(শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়)

বর্ত্তমানে যেরূপ ভাবে সঙ্গীতের চর্চ্চা হইয়া থাকে তাহা দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, কেবল মাত্র আনন্দ উপভোগের জন্যই যেন সঙ্গীত সৃষ্ট হইয়াছে। সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে এবং কি উদ্দেশ্য সাধনে সঙ্গীতের প্রণয়ন হইয়াছিল তাহা অনুসন্ধিৎসু কলাবিদ্গণের বিচার্য্য। 'শ্রুতি' 'রাগ-বিবরণ' 'তালপ্রকরণ' প্রভৃতির জটিল তর্কের মীমাংসা গীত-শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ করিবেন। উহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

এদেশে কেহ বা মুক্তকণ্ঠে, কেহ বা 'মৌনং সম্মতিলক্ষণং' হিসাবে সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। বাংলার বর্ত্তমান সমাজে দুই প্রকারে সঙ্গীত পরিস্ফুট বলিয়া মনে হয়, যথা:—সাধক, ভাবুক বা কবির উচ্ছ্বাস-প্রকাশে এবং আনন্দ-উৎসবে। এতদ্ভিন্ন সঙ্গীতের অন্যরূপ ব্যবহারও নিশ্চয়ই ছিল; নচেৎ 'গানাৎ পরতরং নহি' 'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা' প্রভৃতির তাৎপর্য্য ও ঐ সকল বাক্যের সার্থকতা কি?

এক্ষণে জাতীয় জীবন গঠন-কার্য্যে দেশের উন্নতিকামী সকলেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার জন্য প্রতি গ্রামে পাঠশালা, স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে; ফলে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাগণ বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তথাপি আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না কেন, ইহা ভাবিবার বিষয়। এখনকার ন্যায় তখনও জাতির গঠনে শিক্ষাই একমাত্র সহায় ছিল এবং সাহিত্য ছিল শিক্ষার প্রধান সাধন। সেকালে পাঁচ বৎসরের শিশু গুরুগৃহে যাইয়া লেখাপড়া শিখিত বলিয়া শুনা যায়। তালপাতায় (তালী-পত্র, পাততালি বা পাততাড়ী) লিখিতে হইত আর পড়িবার জন্য ছিল হস্তলিখিত পুঁথি।

শৈশবে হাতের লেখা পুঁথি পড়া নিশ্চয়ই সহজসাধ্য ছিল না; আর সেই কারণেই গুরুদেব বাচনিক শিক্ষা দিতেন। সে যুগের এই শ্রুতিমূলক শিক্ষার কল্যাণে শ্রুতিধরের সংখ্যা তখন বিরল ছিল না। এই শ্রুতিমূলক শিক্ষাপদ্ধতি যে বর্ত্তমানের প্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা সমধিক উন্নত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুরুদেব যাহা ব্যক্ত করিতেন, শিষ্যগণ শ্রদ্ধাসহকারে তাহা শুনিয়া স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিতেন। এই উপায়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান শ্রুতির মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্যসভ্যতার আলোকহীন সুদূর পল্লীগ্রামে এখনও এই প্রথা অনুসৃত হয়। জনসাধারণের শিক্ষার আগ্রহ, সচিত্র পুস্তকাবলী, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী, সুযোগ্য শিক্ষকের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এখনও তিমিরাচ্ছন্ন রহিয়াছি কেন? কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীন যুগের শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যেরূপ অধিক সংখ্যায় আকৃষ্ট হইত, বর্ত্তমান প্রণালীতে সেইরূপ হয় না।

এই শিক্ষা ও সাহিত্য সে যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সঙ্গীতে। শুধু সাহিত্য সহজবোধ্য হইলেও ভাবপ্রবণ উচ্চ আদর্শ সমন্বিত নহে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সঙ্গীত ও নাট্যকলার মধ্য দিয়া রূপলাভ করিয়াছিল বলিয়াই উহা অতি সহজে লোকপ্রিয় হইয়াছিল। সঙ্গীতের মোহন সুরে সিক্ত হইত বলিয়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্যও সাধারণের বোধগম্য হইত। বেশী দিনের কথা নহে, এযুগেই পৌরাণিক কাহিনী, ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ, বীরের জীবনী, সদুপদেশাদিপূর্ণ উপন্যাসাদি কথকতায় গীত হইত। চারণ, ভিখারী ও বৈরাগীগণ ঐ সকল গাথা ও গীতি প্রতি পল্লীতে গাহিয়া বেড়াইত; নাট্যাকারে যাত্রা প্রভৃতিতে অভিনীত হইত। এইরূপে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ সকলের মধ্যে প্রচারিত হইত।

ধর্ম্মানুষ্ঠানেও সঙ্গীত অপরিহার্য্য ছিল। বেদগানে, মন্ত্রোচ্চারণে ও উপাসনায় প্রধানতম অঙ্গ সঙ্গীত। ধর্ম্ম ও নীতিকথা সুরে মধুর করিয়া উক্ত হইত বলিয়া উহা প্রাণস্পর্শী হইত। এইরূপে জাতীয় জীবনের পোষণোপযোগী ভাবাদর্শগুলি সহস্র উৎসবময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সুরসংযোগে একান্ত সহজভাবে প্রচারিত হইত। জাতীয়-জীবন-গঠনোপযোগী চিন্তা ও ভাবধারা, শিক্ষণীয় এবং সাধ্য বিষয়গুলি 'বহুরূপী' বা অন্যান্য

সম্প্রদায়স্থ লোক কর্তৃক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গীত হইয়া সংবাদ-পত্র বা পুস্তকাদি অপেক্ষা অনেক বেশী কার্য্য করিয়া থাকে। জনমত গঠনের ইহা যে প্রকৃষ্ট উপায় তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। অশিক্ষিত জন-সাধারণের হৃদয়ে ভাবের উন্মেষ করিতে সঙ্গীতই প্রশস্ত। হাটে-মাঠে-ঘাটে নিরক্ষর লোকমুখে যে সকল গান গীত হয়, উহা তাহাদের অশিক্ষিত হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস নহে—উহা শ্রেষ্ঠ ভাবুকগণের উৎকৃষ্ট ভাবসম্পদ।

এযুগে এখনও অন্তঃপুরচারিণী, এমন কি শিক্ষিতা মহিলারাও ভিখারী বা ভিখারিণীদিগকে ডাকিয়া পয়সা দিয়া গান শুনিয়া থাকেন। অনেকে ঐ গানগুলি শিখিয়া আত্মীয়া ও প্রতিবেশিনীগণের নিকটে গাহিয়াও থাকেন। এই সকল গানের মধ্য দিয়া জাতীয় আদর্শ নর-নারীর প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতীয় জীবন সঞ্জীবিত করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পুস্তকাদি বা সংবাদ-পত্র অপেক্ষা শ্রুতিমূলক জ্ঞান সমধিক ফলপ্রদ। সুরসংযোগ হয় বলিয়াই এই সকল শ্রুতিমূলক শিক্ষা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার রুচিকর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। জাতির প্রাণের স্পন্দন ও ও অনুভূতি জাগাইতে সঙ্গীতের সুরই যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন, তাহা উপরিউক্ত বিবরণসমূহে স্বপ্রকাশ।

রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য কোনও সভাসমিতির অনুষ্ঠানে ও উৎসবাদিতে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে এবং পরে আলোচ্য বিষয়ের ভাবাত্মক সঙ্গীত এখনও গীত হইয়া থাকে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সমাগত জনসঙ্ঘের মনে আলোচ্য বিষয়ের ভাব গভীর ভাবে মুদ্রিত করা; এবং কার্য্যান্তেও পুনরায় উক্ত ধরণের গীত শ্রবণ করিয়া সভামণ্ডপ হইতে বাহির হইলে সেই সুরের ধ্বনি বহুদিন যাবৎ কর্ণে ঝঙ্কৃত হইয়া হৃদয়কে ভাবপ্রবণ করিয়া রাখে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঐ সকল ক্ষেত্রে সঙ্গীত প্রকাশ্যভাবে যোগ্য স্থান না পাইলেও পরোক্ষভাবেও যে দেশহিতৈষণার উন্মেষক, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গ্রাম্য সঙ্গীতেও জাতীয় জীবন প্রতিভাত। পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়েরই নরনারী অবসর কালে জাতীয় নৃত্যগীতে মত্ত হইয়া শ্রান্ত দেহে নবশক্তি লাভে যত্নবান। ঐ সকল গানের সুরলয়ে ও বাদ্যে মুগ্ধ ও উন্মত্ত হইয়া সমগ্র গ্রামবাসী উহাতে যোগদান করিয়া এক অপূর্ব্ব মহান ভাবের সৃষ্টি করে। অনেকেই এদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। পরস্পরের মধ্যে প্রীতিস্থাপনের ও সখ্যবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার পক্ষে ইহা যে অত্যাবশ্যকীয় তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া বলা বাহুল্য মাত্র।

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, বর্ত্তমানে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথোচিত উৎসাহ পাইয়া যথারীতি পরিচালিত হইলে ইহা যে জাতীয় জীবন-গঠনে প্রধান সহায় হইবে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

ভৈরবী বাহার—মধ্যমান।

কি সুন্দর দিন—আনন্দে উঠে হিয়া
ভরিয়া। হের হে নয়ন খুলিয়া
গগনে শত বর্ণ ঢালিয়া
রাঙ্গিল কে।
তাঁহারে ডাক ভরি' প্রাণ ভুলি' সব—
রহ তাঁর পদ ধরিয়া॥

ক্ষিতীন্দ্রনাথ

গান্ধারী তোড়ী—তেতালা।

তব পদে লভি' চিতে
উঠে মুঞ্জরিয়া
গীতি শত নব রাগে।
তব হাসি ফুটুক
করিয়া মম
মরম-বনে সুরভিত—
তব পদে এই ভিক্ষা জাগে॥

ক্ষিতীন্দ্রনাথ

আলাইয়া—ধামার।

তাঁরি দেখ ভুবনে মোহন ভাব
মহিমা বিচিত্র সবে হে—
হর্ষে গাও—গাও—গাও—গাও।
শোন গগন-অঙ্গনে বীণা বাজে
তাঁহারি—জীবের প্রাণদায়ী।
প্রাণনাথ তিনি, বন্ধু সখা তিনি—
তিনি আছেন ভুবন তিন ভরি'।
তবু তুমি বন্ধু! কেন বিষাদে
মগ্ন-পরাণ?

ক্ষিতীন্দ্রনাথ

খট—তেওট।

অনুখন চাহি প্রিয়
তব সঙ্গ হে—সাথে রেখো
সদা হাতে মোর ধরি'।
ডুবায়ে দাও হিয়া
তোমার প্রেমে
দুখতাপ সব হরি'॥

ক্ষিতীন্দ্রনাথ

ভৈরবী—তেওরা।

অরূপেরি রূপ হেরে এই
ফেরে না আঁখি;
মনে লাগে সারা জীবন
তাকায়েই থাকি।
কি যে শুভ্র সুনীল আকাশ
কি যে গন্ধ-মধুর বাতাস
কি বিচিত্র ফুলের বিকাশ
লক্ষ বরণ পাখী।
মনে লাগে এমনিতরই
থাকি চাহিয়া
আর চেয়ে চেয়েই যুগ-যুগান্ত
যাউক্ বাহিয়া।
আকাশ ভরা দৃষ্টি তাঁহার,
ছুলাক যত গীতি হিয়ার,
আনন্দে গাই—শোনাই তাঁরে
ঐ চোখে চোখ রাখি'॥

নির্ম্মলচন্দ্র

রামপ্রসাদী।

(মন) ভুলিস্ নেকো আর আপন মায়ে।
আমার যে মা বিশ্ব সারা আছেন ছেয়ে॥ (ধুয়া)
দেখ্‌রে চেয়ে হৃদয় খুলে
প্রেম খেলে মা'র ভুবন জুড়ে—
তারায় তারায় গ্রহে গ্রহে—
মাথা নো'য়া মায়ের পায়ে।
দুখের আঁধার যাবে ঘুচে
নয়নের জল যাবে মুছে,
বারেক যদি হৃৎকমলে
ধরে রাখিস্ আপন মায়ে।
ছুটে চল্‌রে মায়ের কোলে—
ভুল্‌বি নেকো ভবের দোলে;
সকল জ্বালার জ্বালার মাঝে
(তুই) বসে রইবি নিরাময়ে॥

ক্ষিতীন্দ্রনাথ

সায়ংকাল।

* * *

এবার আমায় ডাকলে দূরে
সাগর-পারের গোপন পুরে।
বোঝা আমার নামিয়েছি যে,
সঙ্গে আমায় নাও গো নিজে,
স্তব্ধ রাতের স্নিগ্ধ সুধা
পান করাবে তৃষ্ণাতুরে।
আমার সন্ধ্যাফুলের মধু
এবার যে ভোগ করবে বঁধু।
তারার আলোর প্রদীপখানি
প্রাণে আমার জ্বাল্‌বে আনি'
আমার যত কথা ছিল
ভেসে যাবে তোমার সুরে।

রবীন্দ্রনাথ

* * *

এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন-মাঝে চরা।
এরি গোপন হৃদয়-পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।
বিরহী তোর সেইখানে যে
একলা বসে' থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
নামটি তোমার ডাকে।
দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিল্‌বে তবে
সুধায় সুধায় ভরা॥

রবীন্দ্রনাথ

* * *

না গো এই যে ধূলা, আমার না এ।
তোমার ধূলার ধরার পরে
উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে।
দিয়ে মাটি আগুন জ্বালি'
রচ্‌লে দেহ পূজার থালি,
শেষ আরতি সারা করে'
ভেঙে যাব তোমার পায়ে।
ফুল যা ছিল পূজার তরে,
যেতে পথে ডালি হ'তে
অনেক যে তা'র গেছে পড়ে।

কত প্রদীপ এই থালাতে
সাজিয়েছিলে আপন হাতে,
কত যে তার নিবল হাওয়ায়
পৌঁছল না চরণছায়ে ॥
রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থ-পরিচয়।

আসাম-প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড)—আসামপর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১৶৹ মাত্র।

গ্রন্থকার আসামের নানা প্রসঙ্গ অনেকদিন যাবৎ আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থ তাঁহার সেই উদ্যমেরই একটী ফল। গ্রন্থকার ইহাতে বেশ উপভোগ্য আকারে আসামের সামাজিক ব্যবস্থা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আমরা তাঁহার নিকট এই বিষয়ে আরও বিশদ ভাবে আলোচনার আশা করি। আকারের তুলনায় গ্রন্থের মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে বোধ হইল।

ছোটদের গল্প—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১৶৹ মাত্র। ২১০/৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গল্পগুলি বেশ সরস ভাবে বালক-বালিকাদের ঠিক উপযোগী করিয়াই লেখা হইয়াছে। যাহাদের জন্য লিখিত হইয়াছে, তাহারা ইহা পাঠ করিয়া যে আনন্দলাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গল্পগুলি যেরূপ আগ্রহজনক সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ। শিশুসাহিত্য-বিভাগে বালক-বালিকাদের একটী বিশেষ অভাব মোচনের জন্য আমরা গ্রন্থকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

আউলচাঁদ বাউলের গান—শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক কাশী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৶৹ মাত্র।

কতকগুলি গানের ও কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি বর্ত্তমান সামাজিক আচার-ব্যবহারকে বিদ্রূপ করিয়া লেখা হইয়াছে। ভণ্ডামি ছাড়াইবার জন্য প্রতি কবিতাতেই যে একটা চেষ্টা চলিয়াছে, তাহারই ফলে কাব্যকলাবিহীন হওয়া সত্ত্বেও কবিতাগুলি নিতান্ত নীরস হয় নাই।

গো-সেবামাহাত্ম্য—শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। মূল্য ৶৹ আনা।

গো-সেবার মাহাত্ম্য প্রমাণ করিবার জন্য শাস্ত্রবচন ও শাস্ত্রীয় উপদেশের সংগ্রহ করা হইয়াছে।

সদাচারমাহাত্ম্য—শ্রীভোলানাথ বিদ্যাশ্রমি-সঙ্কলিত। মূল্য ৶৹ মাত্র।

গ্রন্থকার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণে সদাচার শিক্ষা দিতে যত্ন করিয়াছেন। আজকাল এই পন্থার সম্যক্ অনুসরণ সম্ভবপর না হইলেও কতকগুলি নিয়ম আজও পালন করা যায় এবং আমরাও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।

নীহারিকা—কতকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা ও নিবন্ধের সমষ্টি। দুই-একটী রচনা মন্দ লাগিল না।

বর্ণ ও বানান—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। সাধারণ বর্ণপরিচয়ের মত। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বোঝা মাথায় করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিলে, বাহক যদি বোঝাটা একটু লঘু বোধ করে তাহাতে দোষ কি? আমি সেই পক্ষেই একটু চেষ্টা করিয়াছি।"

The Apostles & Missionaries of the Navavidhan :—শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কাপড়ে বাঁধাই ৫৲, কাগজে বাঁধাই ৩৲। এই পুস্তকে নববিধান সমাজের স্থাপন ও উন্নতিকল্পে যাঁহারা প্রাণপাত করিয়াছেন তাঁহাদের এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রাজা রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত স্পষ্ট ভাবে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। এই পুস্তক পাঠে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মূল ভিত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে—খুব পরিষ্কার না হইলেও—সাধারণভাবে যে একটী ধারণা জন্মে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমালোচ্য গ্রন্থে নববিধানের বীজ বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই যদি অবিসম্বাদিভাবে নববিধানের বীজ হয়, তাহা হইলে আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত নববিধানের প্রভেদ কোথায়? মোটের উপর গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

ব্রাহ্মণ্যদায়িত্ব—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর প্রদত্ত অভিভাষণ। মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

পুস্তিকার অন্তর্নিহিত মূল ভাবের সহিত আমরা একমত, কিন্তু তাহার সাধনের উপায় সম্বন্ধে আমরা সকল প্রস্তাবের ও মন্তব্যের সমর্থন করিতে পারি না। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমানে বালক-বালিকাগণকে সদাচারমূলক সুশিক্ষা প্রদানের বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সেই সুশিক্ষা যে বর্ণপরিচয় পুস্তকে "'ক' এ কুকুরের" বদলে "'ক' এ কমলা বা কালী" লিখিলেই সম্পন্ন হইবে তাহা আমাদের বিশ্বাস নহে। বর্ণপরিচয়ে কবিতা দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, কবিতা যদি দিতেই হয় ত সহজ ভাষায় প্রার্থনা স্তব আদি সন্নিবেশ করিলে শিশুগণের মনে ধর্ম্মভাব জাগিতে পারে। চতুর্থ প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, কেবল কোনও এক ব্যক্তি তিন বৎসর কেন শত বৎসর ধরিয়াও দেবানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিলেও

যে হিন্দুজাতির দুর্দ্দশা দূর হইবে, তাহা বোধ হয় না; কিন্তু প্রত্যেক হিন্দুই যদি হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য নিত্য প্রার্থনা করেন এবং যথাসাধ্য সমাজের উন্নতিকল্পে কার্য্য করেন তবেই যদি কিছু ফল হইতে পারে। মহারাজ শিবাজী, রাজা প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি যাঁহাদের কথা প্রার্থনার ফলে উন্নতিলাভের নিদর্শনস্বরূপে গ্রন্থকার উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বয়ং উপাসনা করিতেন ও তদনন্তর স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন—বেতনভোগী পূজারী রাখিয়া প্রতিনিধি দ্বারা পূজাকার্য্য সম্পন্ন করাইতেন না। এতদ্ভিন্ন আরও দুই একটা স্থলে আমাদের সামান্য মতভেদ আছে। যাহা হউক, গ্রন্থকার যে অন্ততঃ বর্ত্তমান সমাজের দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহা মোচনের চিন্তাও করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি-এ, এম-বি সম্পাদিত সচিত্র সংস্করণ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

বাঙ্গালীর কাছে মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্যের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়াই বোধ হয়। তাহার উপর দীননাথ বাবুর ভূমিকা ও টীকায় সুসজ্জিত হইয়া এই সংস্করণটি সত্যই বিদ্বজ্জনমনোরঞ্জক হইয়াছে। দীননাথ বাবু নিজে প্রাণ দিয়া মধুসূদনকে বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় ভূমিকায় মধুসূদনের মনের ভাব অতি স্বচ্ছ ভাষায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। বস্তুতঃ মাত্র ভূমিকাটীই যদি কেহ মন দিয়া পাঠ করেন, তবে তিনি যে অনেকটাই মাইকেলকে বুঝিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল চিত্রটীর বিষয়ে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। চিত্রকর রাধার ছবি আঁকিয়াছেন—কিন্তু সেই পুরাকালেও কি আমাদের দেশের মহিলাগণের আধুনিক কালের ন্যায় পরিচ্ছদ ছিল? চিত্রটী হইতে মনে সেই ধারণাই আসে।

টুকটুকে রামায়ণ—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। 'বসুমতী সাহিত্যমন্দির' হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ সচিত্র।

রামায়ণটি অতি সুন্দর হইয়াছে। অতি সরল মনোরম ভাষায় ভারতের আপামরসাধারণের হৃদয়ের ধন শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকাহিনী নবকৃষ্ণ বাবু নূতন ভাবে শিশুদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। সরল স্বচ্ছ ভাষার স্রোতে রামায়ণী কথার তরণী তর্ তর্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—কোথাও তাহার গতির বিরাম নাই, যতির পতন নাই। যেমন সুন্দর ছবিগুলি তেমনি সুন্দর লেখা। ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর, শিশুগণকে উপহার দিবার যোগ্য বটে। তবে ইহার একটী মাত্র কলঙ্ক এই যে, ভাষা প্রাদেশিকতাদোষদুষ্ট। কলিকাতা অঞ্চলের বালকগণ এই গ্রন্থের ভাষা সহজে বুঝিতে পারিলেও পূর্ব্ববঙ্গবাসী শিশুগণ তত সহজে বুঝিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। তবে আমরা আশা করি ভবিষ্য সংস্করণে "চন্দ্রের" এই কলঙ্কও অদৃশ্য হইবে।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ ও আত্মচিকিৎসা—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্. বি প্রণীত। স্বাস্থ্যধর্ম্মসঙ্ঘ ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵১০ পয়সা মাত্র।

গ্রন্থকার একজন বহুদর্শী ও খ্যাতনামা চিকিৎসক। ইহাতে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ ও চিকিৎসা অতি সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকটি পাঠ করিলে ম্যালেরিয়া রোগীকে এই চিকিৎসাবিপ্লবের যুগে আর অর্থলোভী চিকিৎসকগণের বিভিন্ন মতামতের উপর নির্ভর করিয়া নিজ জীবন বিপন্ন করিতে হইবে না। তিনি নিজেই অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারিবেন যে, কি উপায়ে চলিলে ম্যালেরিয়া হইতে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করা যায়। এই পুস্তকে বর্ণিত ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক উপায়গুলির প্রতি আমরা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা মনের সহিত ইচ্ছা করি যে, গ্রন্থকার যে দেশহিতৈষণাপ্রণোদিত হইয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তাহা জয়শ্রীশোভিত হইয়া সার্থক হউক।

The Hindu Sangathan & our depressed brethren:—পণ্ডিত শঙ্করনাথ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।

জাতিগত অস্পৃশ্যতা যে অতিশয় অন্যায় ও মনুষ্যত্বের বিরোধী সে বিষয়ে ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন কোনও ব্যক্তিরই বোধ হয় সন্দেহ নাই। প্রকৃতই যখন দেখা যায় যে ব্রাহ্মণকুলে জাত উপবীতধারী কোনও ব্যক্তি যদি লম্পট ও মদ্যপও হয়, তথাপি তাহাকে যে কোনও ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিতে পারেন; কিন্তু নীচকুলে জাত কোনও ব্যক্তি অতীব উন্নতমনা ও সর্ব্বদোষবর্জ্জিত হইলেও তাহাকে স্পর্শ করিলেই তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই অস্বাভাবিকতা ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে যে ভয়ানক পীড়া দিতে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গোঁড়া হিন্দুও এই বিষয়ে ব্যথা পান, কিন্তু তাঁহারা এই অস্পৃশ্যতা শাস্ত্রানুমোদিত মনে করিয়া ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করেন না। তাঁহাদের জন্যই পণ্ডিত শঙ্করনাথের এই পুস্তিকা। ইহাতে সকল শাস্ত্রের মূলস্বরূপ বেদাদি হইতে গ্রন্থকার স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের কোনও স্থানেই অস্পৃশ্যতারূপ

এই অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। তবে এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সন্দেহ হয়, কেহ কেহ শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া পরিত্যাগ করিবেন কি না।

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্‌সি।

সংবাদ।

বক্তৃতা—গত ৯ই ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে একটী বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতা 'সেণ্ট পল' কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পি জি ব্রীজ এম-এ, ডি. ডি মহোদয় আমাদের আহ্বানে সানন্দে বক্তার আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে সুগায়ক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল একটী সঙ্গীত করেন। অতঃপর আদিব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 'পিতা নোঽসি' মন্ত্র পাঠ করিয়া উপস্থিত সভাগণের সহিত বক্তার পরিচয়-সাধনপূর্ব্বক সভার উদ্বোধন করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় প্রায় এক ঘণ্টাকাল ইংরাজীতে 'দুঃখ-সমস্যা' (Problem of Suffering) বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি জগতের এই চিরন্তন সমস্যাটীর উপর একটু নূতন আলোক দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত সরোজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বক্তার আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া বক্তাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অবশেষে পুনরায় একটী সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

নানাকথা।

ভাষপত্র।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে হিন্দুসমাজে তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। কি ভাবে ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তাহার বিধান লইবার জন্য গ্রামের অধ্যাপকের নিকট যাইতে হয়। অধ্যাপক যেরূপ ব্যবস্থা দান করেন, তদনুসারে ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থকে তাহা সুসম্পন্ন করিতে হয়। চলিত ভাষায় ঐ ব্যবস্থাপত্র 'ভাষপত্র' নামে খ্যাত। অধ্যাপক বা পুরোহিতের নিকট ঐ ভাষপত্র লইতে হইলে ন্যূন পক্ষে তাঁহাদিগকে আট আনা অন্ততঃ চারি আনাও পারিশ্রমিক স্বরূপ দিতে হয়। এই পারিশ্রমিকের আর একটি নাম 'তৈলবট'। তৈলবট শব্দের প্রকৃত অর্থ "তেলের কড়ি"। ব্যবস্থাপত্র বা ভাষপত্র লিখিয়া দিয়া অর্জ্জিত অর্থ অধ্যাপক-পণ্ডিতেরা নিজে গ্রহণ করিতেন না; উহা চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের রাত্রিকালে অধ্যয়নের জন্য তৈলক্রয়ে ব্যয়িত হইত।

'বট' শব্দের অর্থ যে কড়ি তাহার প্রমাণ আছে। শুভঙ্করীতে "কাগ চতুর্থ বট বাখানি" আছে। উহার অর্থ চারি কাগে এক বট বা কড়া। "সাতাশ যবে বট বিচার" অর্থাৎ সাতাইশ যবে এক কড়া। কড়া বা কড়ি একই। তাই 'তৈলবট' অর্থে 'তেলের কড়ি'।

আমরা শৈশবে কড়ির ব্যবহার দেখিয়াছি। বাজারে ২০ গণ্ডা কড়ি দিলে এক পয়সার জিনিস পাওয়া যাইত। আবার পয়সা ভাঙ্গাইলে ২০ গণ্ডা কড়ি মিলিত। তখনকার হিসাবে ১০ গণ্ডা কড়ি অর্দ্ধ পয়সা,৫ গণ্ডা কড়ি সিকিপয়সা; পূর্ব্বে লোকে আধ পয়সা সিকি পয়সারও জিনিস কিনিত। পানের চুণ খরিদ করিবার সময় দশ কড়ারও চুণ মিলিত, তাহা নিজে দেখিয়াছি। আজকালকার দিনে অর্দ্ধ পয়সায় কোন কোন ক্রেয় বস্তু মিলিতে পারে, কিন্তু সিকি পয়সায় কোন জিনিস মিলে না। ক্রমে আমদানি অভাবে কড়ি দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িল। ২০ গণ্ডার স্থলে ১৬ গণ্ডা, পরে ১২ গণ্ডা কড়ি এক পয়সার সমতুল হইল। আজকাল কড়ি দুষ্প্রাপ্য। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে কড়ি মিলে না। অথচ শাস্ত্রে কড়ি দিবার ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বে তাম্রমুদ্রাদির পরিবর্ত্তে কড়ির প্রচলন ছিল।

এখানে আর একটি কথা বক্তব্য। ধারাপাতে আছে 'কুড়ি গণ্ডায় এক আনা'। কিন্তু এই গণ্ডাটা কি কড়ির গণ্ডা? তাহা হইতে পারে না। কেন না আমরা বাল্যে ২০ গণ্ডা কড়ি এক পয়সার সমান দেখিয়া আসিয়াছি। এ সম্বন্ধে যদি কেহ আলোক দিতে পারেন ভাল হয়।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

ক্রটী স্বীকার।

আমাদের যন্ত্রালয়ের 'প্রেসম্যান' হঠাৎ 'নিউমোনিয়া' রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এবার ফাল্গুন-সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশে এরূপ অযথা বিলম্ব ঘটিয়া গেল। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

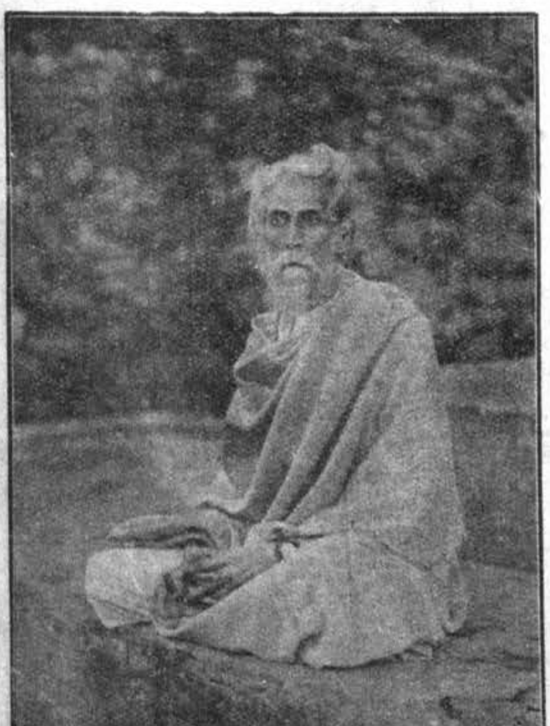
কর্ম্মাধ্যক্ষ।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (বার্দ্ধক্যে)



শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

চিত্র-সূচী ।

তত্ত্ববোধিনীর নিয়মাবলী।

গ্রাহক।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইলেও সেই বর্ষের প্রথম হইতেই পত্রিকা লইতে হইবে।

২। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৵০ আনা। অসমর্থ, মহিলা ও ছাত্রদের জন্য ২৷৵০।

৩। অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত পত্রিকা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

৪। তিন আনার ডাকটিকিট, নাম ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠাইলে একখণ্ড পত্রিকা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়। হাতে হাতে নমুনা দেওয়া হয় না।

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠান হয়। অতিরিক্ত খরচ প্রায় ।০ চারি আনা লাগে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৭। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৮। যিনি ৫ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবেন তিনি একবৎসর বিনা মূল্যে পত্রিকা পাইবেন।

প্রবন্ধ।

৯। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, জীবনী, সমাজ-সমস্যা সাহিত্য, ভ্রমণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ ও উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১০। লেখক যতই নবীন হউন, রচনা প্রকাশোপযোগী হইলেই সাদরে গ্রহণ করা হয়। নবীন লেখকগণের নিকট হইতে আমরা প্রধানতঃ সহজ ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান (রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিজ্ঞানের সর্ব্ববিধ বিভাগ) এবং অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ ও ভ্রমণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাইবার আশা করি।

১১। রচনার সঙ্গেই উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ও নামধাম যুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে রচনা (প্রবন্ধ বা কবিতা) মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া যায়। তবে ডাকের গোলযোগে হারাইলে আমরা দায়ী হইব না।

১২। রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

১৩। বিজ্ঞাপনদাতাগণ মনে রাখিবেন যে এই পত্রিকা ৮৪ বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার বিজ্ঞাপনের হার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। এবং এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অন্য পত্রিকার দুই পৃষ্ঠার সমান।

সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	....		১০৲	প্রতিমাসে।
"	½ "	....		৬৲	"
"	¼ "	....		৪৲	"
"	⅛ "	....		২৲	"
কভারের	১ম	পৃষ্ঠার	নিম্নভাগে	১০৲	
"	২য়	"	......	১৫৲	
"	"	"	অর্দ্ধেক	৮৲	
"	৩য়	"	......	১২৲	
"	"	"	অর্দ্ধেক	৭৲	
"	৪র্থ	"	"	২০৲	
"	"	"	অর্দ্ধেক	১০৲	

১৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যে মাসে মূল্য না পাওয়া যাইবে সে মাসে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

১৫। এককালে এক বৎসরের বন্দোবস্ত করিয়া ৬ মাসের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২৫৲ টাকা, ৬ মাসের বন্দোবস্ত করিয়া ৪ মাসের মূল্য দিলে শতকরা ১২৲ টাকা এবং ৩ মাসের বন্দোবস্তে ২ মাসের অগ্রিম দিলে শতকরা ৬৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

১৬। পুরাতন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়ম বলবৎ রহিল।

১৭। এজেণ্ট হইলে টাকায় ।০ আনা কমিশন পাইবেন।

১৮। মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এবং বিনিময় ও সমালোচনার পুস্তকাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

চৈত্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

৯৯২ সংখ্যা ১৮৪৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭৫। অঞ্জলি—প্রেমদাতা দেবতা।

১। দেশে দেশে ভক্তগণ তোমারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। তুমিই ভক্তগণের মধ্যে প্রেমের বন্ধনরূপে অবস্থিতি করিতেছ। আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি তোমার চরণে সমুত্থিত হইতেছে, আবার তোমার স্নেহপ্রেম আমাদের মস্তকে অবিরলধারে ঝরিতেছে। তোমার সেই স্নেহপ্রেম আমাদিগকে সকল বিপদ আপদে রক্ষা করুক।

২। দেশে যখন জলের অভাবে ব্রীহি ধান্য প্রভৃতি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের উত্তাপে দগ্ধ হইয়া পাংশুবর্ণ হইয়া যাইতেছিল, তখন তোমারই প্রেম বারিধারায় অবতীর্ণ হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। প্রজাগণ জীবন লাভ করিয়া বলশালী হইল এবং তোমার আদেশ পালনে নিযুক্ত হইল।

৩। আমাদিগকে বিপদ আপদ চারিদিকে ঘিরিয়া আছে। আমাদিগকে নিহত করিবার জন্য শত্রুগণ উন্মুখ হইয়া আছে। তুমি সকলই জানিতেছ। ব্যোম যেমন বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তুমিও তেমনি তোমার এই ব্রহ্মচক্রের আদ্যন্তমধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। আমাদের বিপদজাল কাটাইয়া দিয়া এবং শত্রুগণকে অপসারিত করিয়া হে আনন্দস্বরূপ! তোমারই আনন্দে আমাদিগকে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট কর। তুমি আমাদের মনের নিয়ন্তা। আমাদের অন্তরে তুমি শুভবুদ্ধি প্রদান কর, যাহাতে দীপ্যমান পরমেশ্বর তোমাকে আমাদের সকল শুভকর্ম্মে আহ্বান করি। অন্নজল দিয়া তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

৪। সমুদ্রেরই জল যেমন বারিধারায় নামিয়া নদীরূপে সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তোমারই স্নেহপ্রেম শ্রদ্ধাভক্তির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তোমারই অক্ষয়ভাণ্ডারে উপনীত হয়। তোমার অক্ষয় প্রেম আমাদিগকে সর্ব্বদাই দুঃখশোক ও বিপদ-আপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে।

৫। আমাদের প্রাণ যখন বড়ই কাতর হইয়া তোমাকে ডাকে, তখন বর্ষাকালের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে জলধারা নামিয়া যেমন ধরণীকে সিক্ত করে, সেইরূপ তোমার ঘন স্নেহধারা নামিয়া আমাদিগকে শীতল করে। তখন সকল দুঃখ, সকল বিপদ ভেদ করিয়া প্রাণের মধ্যে নব নব ভাব জাগিয়া প্রাণকে শ্যামল করে।

৬। হে প্রভু! আমরা নিজদোষে তোমার স্নেহধারা নামিবার পথ অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলাম। অবশেষে তুমি তোমার শতমুখ বজ্রের দ্বারা সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমাদের অন্তরে সেই স্নেহধারা প্রেরণ করিয়া তাহার বন্যায় আমাদিগকে ভাসাইয়া দিলে। আমরা তোমারই কৃপায় রক্ষা পাইলাম। আমরা নবজীবন লাভ করিয়া দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

৭। সমুদ্রের তরঙ্গসকল যেমন সমুদ্রেরই চরণে পতিত হইয়া নিলীন হয়, তেমনই তোমারই ক্রোড়ে অবস্থিত আমাদের ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইয়া আবার তোমারই চরণে নিলীন হয়। তোমার বলেই আমরা বলীয়ান, তোমার শক্তিতেই আমরা শক্তিমান। আমাদিগকে তুমি শক্তি দাও, যাহাতে মন্দ যাহা কিছু, অমঙ্গল যাহা কিছু, সে সমস্তকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া ভাল যাহা কিছু, মঙ্গল ও কল্যাণজনক যাহা কিছু, তাহাই জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি।

৮। হে সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর! মঙ্গলের পথে একপদ অগ্রসর হইলে তুমিই আমাদিগকে সহস্রপদ অগ্রসর করিয়া দাও। শুভ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিলে তুমিই তাহা সংসিদ্ধ করিয়া দাও। ব্রহ্মচর্য্যের পথে থাকিলে তুমিই আমাদের শরীরকে বজ্রের ন্যায় দৃঢ় করিয়া দাও এবং মনকে শত হস্তীর বলে বলীয়ান কর। জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইলে তুমি আমাদিগকে বিশ্বদর্শনের ক্ষমতা প্রদান কর। সত্যের পথে ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইলে তুমি আপনাকে দিয়াও আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

৯। আমরা শত্রুগণের ভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। তুমি অতি পুরাণ, অতি মহান্। তুমি আমাদের শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া আমাদের আনন্দবিধান কর। আমাদিগকে তোমার বলে বলীয়ান কর। তুমিই আমাদের সকল সুখের আকর। আমরা যখন শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হই, তখন তুমিই আমাদের সেনাপতি হইয়া আমাদিগকে সংগ্রামের কৌশল প্রদর্শন কর। তুমিই আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান কর, এবং আমরা শত্রুবিজয়ীর বেশে গৃহে প্রত্যাগমন করি।

১০। হে পরমেশ্বর! অধর্ম্ম যখন ধরাতলকে আচ্ছন্ন করে, তখন তুমি রুদ্রবেশে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মকে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য তোমার বজ্রদণ্ড নিক্ষেপ কর। তাহার প্রচণ্ড তেজে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠে এবং তাহার ভীতিজনক শব্দে ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে।

১১। তুমি প্রাণের প্রাণ। তোমা হইতেই জগতে প্রাণ নিশ্বসিত হইয়াছে। তোমারই ভয়ে বিশ্বজগত হইতে মৃত্যু দূরে পলায়ন করিয়াছে। ইহলোকে থাকি বা লোক-লোকান্তরে যাই, আমরা তোমারই অমৃতপানে অমর হইয়া তোমারই মহিমা-কীর্ত্তনে অনন্তকাল নিযুক্ত থাকিব। ইহলোক ও পরলোকে তুমি তোমার স্নেহপ্রেমে আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিবে। তুমি মহান্—অতি মহান্।

১২। হে অমিতবল! তোমার জ্ঞান ও বলক্রিয়া স্বাভাবিক। এই জগতসৃষ্টিতে তোমার জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম সমস্তই একাধারে প্রকাশ পাইতেছে। তুমিই বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমারই শক্তিতে এই বিশ্বজগতের অণুপরমাণুও আশ্চর্য্য শক্তির আধার হইয়া আছে।

১৩। এই বিস্তীর্ণ ধরণীরই আয়তন আমরা কল্পনা করিতে পারি না। এই সুবিস্তৃত আকাশেরও আয়তন আমাদের ইয়ত্তার অতীত। এই ভূলোক দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া যে তুমি বিরাজমান আছ, তোমাকে কি প্রকারে অন্তরে ধারণা করিব? তুমি অতুলনীয়। তোমার তুলনা তুমিই।

১৪। ভূলোক ও দ্যুলোক তোমা কর্ত্তৃকই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ভূলোক ও দ্যুলোক তোমার শরীর। ভূলোক ও দ্যুলোক তোমাকে জানে না। অন্তরীক্ষ তোমা কর্ত্তৃকই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অন্তরীক্ষ তোমার শরীর। অন্তরীক্ষ তোমাকে জানে না। তুমি আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ তোমা হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ তোমা কর্ত্তৃকই এই ভূতসকল জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ তোমাতেই এই ভূতসকল প্রবেশ করে। তোমার আদিও কেহ জানে না, তোমার অন্তও কেহ খুঁজিয়া পায় না।

১৫। আমাদের পিতৃপুরুষেরা সংসারের বিপদ-আপদে পড়িয়া তোমাকেই ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিয়াছিলেন। তুমি তাঁহাদের বিপদজাল মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলে। তাঁহারা বিপদমুক্ত হইয়া তোমার নামে জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন। আমরাও সংসারসংগ্রামে তোমারই আদেশে অবতীর্ণ হইয়া বিপদজালে পরিবৃত হই-

য়াছি। তুমি দয়া করিয়া আমাদের সেই বিপদসমূহ কাটাইয়া দাও। আমরা বিপদজাল অতিক্রম করিয়া তোমার চরণতলে উপস্থিত হইব এবং গগন-বিদারী স্বরে তোমার নামে আনন্দধ্বনি করিব। তুমিও আমাদের আনন্দে আনন্দিত হইবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

(অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল, এম-এ)

সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রবাহ যখন এত প্রবল যে, মানুষ সংসার ও জড়-রাজ্যের সীমানা ছাড়াইতে অক্ষম, তখন একজন আসিয়া আমাদিগকে দৃঢ়-গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

'হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল! তোমরা শ্রবণ কর। আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।' এই কথা জোর করিয়া কয়জন বলিতে পারেন! যাঁহারা সত্যই সেই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল সেই অন্ধকারের পরপারে দিব্যধামে যাইবার জন্য মানবকে আহ্বান করিতে পারেন। মৃত্যু ও মায়াপ্রপঞ্চের মধ্যে তিনি দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া এই পথের সন্ধান বলিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই ঋষি, প্রকৃতই দ্রষ্টা। সংসারে থাকিয়া সংসারের সমুদায় কার্য্য সাধন করিয়া তিনি পরমেশ্বরের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি দেখিলাম—"অয়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ"। এই সর্ব্বজ্ঞ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই আকাশে। এই জগন্মন্দিরে জগন্নাথকে দেখিলাম।" একবার তাঁহার খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে তিনি বলিয়াছিলেন—"ঈশ্বর যে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন আমি দেখিতেছি, ইহা আর বুঝাব কি? যেমন সামনের দেওয়ালটি দেখা যাইতেছে, তেমনি ঈশ্বর দেখা যাইতেছেন। এই দেওয়াল হইতে ঈশ্বর আমার নিকটের বস্তু, তিনি আমার অন্তরে আছেন—আমার আত্মাতে আছেন"। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান কল্পনা বা পুস্তকগত জ্ঞান নহে—ইহা পরম্পরের সাক্ষাৎলব্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞান। তাঁহার সম্পর্কে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হইয়াছে। মানুষ আপনার আধ্যাত্মিক শক্তির গভীরতা কতদূর যাইতে পারে তাহার পরিচয় পাইয়াছে। সংসারে অসার বস্তু লইয়া যখন ঘুরিয়া বেড়াই, অনিত্য যখন আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে, তখন সম্মুখে একজন ভগবদ্‌জ্ঞানে পূর্ণ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে প্রাণে কত শান্তি লাভ করি। অনিত্যের অন্তরালে নিত্য বস্তু দিন-রাত আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে, অসারের ভিতরে সার লুকাইত; জড়ের মধ্যে প্রাণ। এই আকাশ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বর্ত্তমান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন তাহার সাক্ষ্য। সংসারের স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা এইরূপ জীবনকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাই ইহাকে আমরা এত মূল্যবান মনে করি। মহর্ষির পূত চরিত্রের সংস্পর্শে সমাজ পবিত্র হইয়াছে, মানুষের আশা ও বিশ্বাস বাড়িয়াছে; তাঁহার জীবন আলোচনা করিয়া আমরাও ধন্য হইতেছি।

তিনি আত্মচরিতে বলিয়াছেন, ভগবান স্বয়ং তাঁহাকে তাঁহার দিকে টানিলেন। "আমি কিন্তু প্রথমে কাহারও মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিবার কোন সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই, এবং কৃপা করিয়া কেহই আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন নাই। আমার চারিদিকে কেবল বিলাস ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহার পরে সেই আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন প্রদান করিলেন। তাঁহার এ কৃপার কোথাও তুলনা হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা।"

দিদিমার মৃত্যুর সময়ে তাঁহার মনে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, পরে তাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের পিপাসা বাড়িয়া যায়। দৈবক্রমে একদিন ঈশোপনিষদের এক ছিন্ন পত্র হস্তগত হওয়াতে ক্রমে তিনি উপনিষদ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হন; উপনিষদে তাঁহার হৃদয়ের অভিলষিত জিনিস পাইলেন। "যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং" ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমায় অভিষিক্ত করিল। আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল—আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল।" ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রভাবে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মকে আকার দিলেন। দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বন্দোবস্ত করিলেন। রামমোহন যে

বীজ বপন করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে সেচন করিয়া ক্রমে ব্রাহ্মসমাজরূপ মহা মহীরুহ দাঁড় করাইলেন।

যেমন শাস্ত্রচর্চ্চায় তাঁহার গভীর আকাঙ্ক্ষা, তেমনি প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যে ভগবানের প্রেম দেখিবার জন তিনি পাগল। যখনই সংসারের মধ্যে কোন চিত্তবিক্ষেপের কারণ দেখিতেন, অমনিই বাহির হইয়া পড়িতেন। নদীবক্ষে, অরণ্যের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে, আকাশের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে, পর্ব্বতের গাত্রে শালবনে, গুহা-উপত্যকায় ও অত্যুচ্চ শৃঙ্গের অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যের মধ্যে তিনি ভূমা মহান্ পুরুষকে দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। প্রকৃতির মধ্যে এমন করিয়া মিশিয়া যাইতে কোন সাধককে আর দেখা যায় না।

যে ভূমাকে তিনি নিজের জীবনে পাইয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আবার সকলের পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য তিনি কতই না উৎসুক! যৌবনে যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন ব্রাহ্মসমাজের সেবায় প্রাণ-মন সমর্পণ করিলেন। সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া যখন হিমালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার মধ্যে এক নূতন ভাব আসিয়া জাগিল; তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—

"আবার সেই শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের মেঘ-বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল এবং ঘন ঘন ধারা পর্ব্বতকে সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাঁহার শাসনকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এই সময়ে আমি কন্দরে কন্দরে নদীপ্রস্রবণের নব নব বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। কেহই এ প্রমত্ত গতির বাধা দিতে পারে না। যে তাহাকে বাধা দিতে যায়, নদী তাহাকে বেগমুখে দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে, তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে! কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকায় তাহার কি ক্ষমতা! সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমিসকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামী হইতে হইবে। এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশবাণী শুনিলাম—'তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।' আমি চমকিয়া উঠিলাম।" ইহাতেই তাঁহার জীবনের তত্ত্ব। ধর্ম্মজীবনের প্রথমে তিনি বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া একান্তচিত্তে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহার বাণী শুনিয়া; আবার তাঁহারই বাণী শুনিয়া তিনি আপনার জীবনের গভীর আধ্যাত্মিকতা সমাজের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নির্জ্জনসাধনে যে নিষ্ঠা ও নির্ভর শিখিয়াছিলেন জনসেবায় তাহারই প্রয়োগ করিলেন।

প্রথমাবধিই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা তিনি সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহার পিছনে তিনি আর যাইতে পারিতেন না, তাহাতে যাহাই হউক না কেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ যেই জীবনে অঙ্কুরিত হইল, তাহা প্রচার করিতে চেষ্টা করিলেন; সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিলেন। 'ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকে-নামৃতত্বমানশুঃ।' না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা, কিন্তু কেবল এক ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃতত্বকে লাভ করা যায়। তিনি বলিতেছেন, যখন উপনিষদের এই ভাষ্য দেখিলাম "তখন আর এ পৃথিবী আমার মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, সংসারের মোহগ্রন্থি-সকল আমার ভাঙ্গিয়া গেল।"

দুই বৎসর হিমালয় পরিভ্রমণের পর যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি মুক্তপুরুষ। কোন বিষয়ে তাঁহার আর আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারের আবিলতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াও আপনার হৃদয়কে সেই এক কেন্দ্রের দিকে স্থির রাখিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নূতন উৎসাহে সমাজের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কত স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কত গায়ক প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ইহাঁর সহযোগী হইলেন, ব্রাহ্মসমাজের সে এক জীবন্ত যুগ! নানা ধারায় ব্রাহ্মসমাজের গতি চলিতে লাগিল—জ্ঞানচর্চ্চায়, ধর্ম্মসাধনে, সেবাকার্য্যে সব দিকে ব্রাহ্মেরা অগ্রসর; কিন্তু অধিক দিন সে অবস্থা স্থায়ী হয় নাই, নানা কারণে সমাজের মধ্যে অনেক দলের সৃষ্টি হয় এবং সমাজ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এই দলাদলির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় মহর্ষিজীবনের উদারতা। তিনি আপনার প্রিয়জনের কাছে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, কোন দিনই তাহা তীব্রতায় পরিণত হয়

নাই। ধর্ম্মবন্ধু ও শিষ্যদিগের প্রতি অনুরাগ চিরকালের জন্য অক্ষুণ্ণ ছিল। যখনই তাঁহারা কাছে গিয়াছেন, তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা তাঁহার কাছে আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত সমস্যা মীমাংসার জন্য যাইতেন, কাহারও প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বা বিরাগ দেখা যায় নাই। এমন অনুদ্বেলচিত্ত, উদার, সৌম্যমূর্ত্তির সংস্পর্শ আমাদের ন্যায় মানুষের ভাগ্যে সহজে ঘটে না। তাই মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজ ধন্য যে এই ঋষির সহিত তাহার হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। আজ যে ভারতে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের সঙ্গীতে চারিদিক মুখরিত, তাহা সেই ঋষির তপঃপ্রভাবে। যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন তাঁহার জীবনের সুগন্ধ জগতে ক্রমবিস্তৃত হইবে।

তিনি ব্রাহ্মসমাজকে যে বীজমন্ত্র দিয়া গিয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী। ভক্ত জীবনদেবতার আরাধনায় নিজে মগ্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবন মানুষকে আজ সেই দিকেই ডাকিতেছে। তিনি ভগবানের পূজা করিলেন সংসারে থাকিয়া, নিজের সমস্ত ধনসম্পত্তি নিয়োগ করিলেন তাঁহার সেবায়। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ"। সত্য শিব সুন্দরের প্রতি গভীর প্রেমে মগ্ন থাকিয়া আজ তিনি আমাদিগকে সত্য শিব সুন্দরের ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

অমৃতসরের মন্দিরে দিনরাত পূজার আয়োজন দেখিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মসমাজে সপ্তাহে দুই ঘণ্টা মাত্র উপাসনা হয়, আর শিখদিগের হরিমন্দিরে দিনরাত উপাসনা। কাহারও মন ব্যাকুল হইলে নিশীথ সময়েও সেখানে গিয়া উপাসনা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে। এই সদৃষ্টান্ত ব্রাহ্মদিগের অনুকরণীয়।" আজ তাঁহার এই অভিযোগের কথা বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে। মহর্ষি সূর্য্যোদয়ের সময় গায়ত্রীমন্ত্রে উপাসনা করিতেন, সূর্য্যাস্তের সময়েও তাহাই। প্রাচীন আর্য্যগণের সাধনার ধারা তাঁহার জীবনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ভারতের ঋষিগণের সাধনাকে আপনার হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ছিল বর্ত্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা। সকলেই তাঁহার মত সুযোগ পাইতে পারে না, সাংসারিক স্বচ্ছলতা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সুতরাং আমাদের এমন একটা স্থান থাকা দরকার যেখানে আসিয়া আমরা বলিতে পারি যে, ইহা আমার পিতার ভবন। এখানে সংসারের বিক্ষোভ আসিয়া আঘাত করে না এবং এখানে আমি পরম পিতার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হইয়া দুই দণ্ড বসিতে পারি। শিখদিগের মত যখনই আবশ্যক হয় তখনই আমরা ভগবানের পূজা করিয়া আসিতে পারি। ধর্ম্মসমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে আমাদের পূজার স্থান নির্ম্মল, সুন্দর এবং পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আজ মহর্ষির পুণ্য আত্মা আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলুক। আমরা ভগবানের নামে জাগিয়া উঠি, ভগবানের নামে জীবন ধারণ করি, এবং দিনরাত তাঁহারই পূজার জন্য সকলকে আহ্বান করি। অবিরত তাঁহার অনাহত ভেরীর শব্দ উঠিতেছে, আমরা যেন আর বধির হইয়া না থাকি; যে আলোকে তিনি আপনার প্রাণকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, আমরা আজ সেই আলোকের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

দর্শন-পিয়াস।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল)

অতি তৃষিত তাপিত ব্যথিত চিত মোর
তব দরশন লাগি—
বল বল প্রিয়, কয়ে যাও কানে
বৃথা আমি একি জাগি?
বৃথা বাহিরায় প্রাণের কান্না?
বৃথা বুকে বয় প্রেমের বন্যা?
বৃথা নীলাকাশে আকুল তিয়াসে
চাহে বিয়াকুল আঁখি?
বল বল প্রিয়, কয়ে যাও কানে
বৃথা কি দরশ মাগি?
তোমারেই যদি নাহি পাই,
কোন সুখ তবে নাহি চাই,
মরণ আসুক বঁধুর মতন
সব মোর পুড়ে হোক্ ছাই।
মরণের পারে নব জীবনের
নবীন আলোকে পুনঃ,
নূতন করিয়া খুঁজিব তোমায়
যদি পাই প্রিয়তম।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও উড়িষ্যার হিন্দুশাসন।

(রায়মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায়, বি-এল)

১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উড়িষ্যায় আগমন করিয়া পরবর্ত্তী ১৮ বৎসরকাল পুরীর সাগরতীরে অতিবাহিত করেন। একজন মহাপুরুষের আদর্শে দেশের সমগ্র জাতীয়জীবন কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে,

তাহার দৃষ্টান্ত এই সময়ের ইতিহাসে দেখা যায়। মহাপ্রভুর পুরী আগমন, তাঁহার সহিত সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের কথোপকথন, মহাপ্রভুর সহিত রাজা প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎ ও দীক্ষাগ্রহণ, মহাপ্রভুর সহিত গম্ভীরায় রামরায়ের বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুশীলনের চূড়ান্ত, মহাপ্রভুর শিষ্যদিগের প্রভাব ও মহাপ্রভুর প্রদর্শিত সাধনমার্গে সাধারণলোকের অচল বিশ্বাস তৎকালীন ও তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণবগ্রন্থে বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হইয়া পড়িবে।

পুরীধামে একসময় বৌদ্ধপ্রভাব প্রবল ছিল। পরে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজ এবং তাঁহাদিগের শিষ্যগণের প্রভাবে পুরী হিন্দুধর্ম্মের প্রধান তীর্থ হইয়া দাঁড়াইল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদস্পর্শে ও তাঁহার অলৌকিক জীবনে উৎকলে কি নূতন ভাবপ্রবাহ ও প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহা কোনও গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই; তবে আমার মনে হয়, শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবেই উৎকলবাসীর জীবনসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। সুখে দুঃখে জীবনে মরণে উৎকলবাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর যেরূপ শরণ লইয়া থাকেন অন্য কোনও দেবদেবীর সেরূপ শরণাপন্ন হন না। উৎকলবাসীর হৃদয়মন্দির জুড়িয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু বিরাজ করিতেছেন। গৃহে গৃহে তাঁহার নাম আবালবৃদ্ধবনিতা গ্রহণ করিয়া থাকেন। উৎকলের গ্রাম্য জীবন যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সমগ্র উৎকলব্যাপী শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর বিশাল পরিবার বিরাজ করিতেছে। বিবাহে, উৎসবে, ক্রিয়াকর্ম্মে ও সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ব্যাপারে উৎকলবাসী পবিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করিয়া কখনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। যে নরদেবতা দীনহীন বেশে প্রেমের সাধনায় পুরীতে জীবনযাপন করিতেন, তাঁহারই জলন্ত দৃষ্টান্তের ফলস্বরূপ উৎকলবাসীর হৃদয়ে ভক্তি-প্রস্রবণ উৎসারিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবপদাবলী ও বৈষ্ণবসাহিত্য বাংলাসাহিত্যের প্রাণের প্রাণ ও জীবনের জীবন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর অভিনব বৈষ্ণবপদাবলী প্রচারের সহিত বঙ্গসাহিত্যে যে নবযুগ আসিয়াছিল, সে নবযুগের প্রভাব উৎকলসাহিত্যেও অনুভূত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ 'উড়িয়া ভাগবত'-প্রণেতা জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন প্রিয়শিষ্য ছিলেন। জগন্নাথদাস অতি বড় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। জগন্নাথ দাসের ভাগবত সাহিত্য হিসাবে উড়িয়া ভাষার একটি অমূল্য গ্রন্থ। সরল ভাষায় বৈষ্ণবধর্ম্মের উচ্চাদর্শ জগন্নাথ দাস যেরূপ সাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন, অন্য কোনও উৎকলীয় কবি সেরূপ করেন নাই—ভবিষ্যতে কখনও করিবেন কি না সন্দেহ। তালপত্রে লিখিত উড়িয়া ভাগবত আজিও উড়িষ্যার গৃহে গৃহে দেবতা জ্ঞানে পূজিত হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি 'ভাগবত-ঘর' আছে। এই ঘরটি সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামবাসিগণ এই গৃহে মিলিত হইয়া ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিয়া থাকেন। ভাগবত-পুঁথির নিকট নিত্য পূজা ভোগ ও আরতি হইয়া থাকে। গ্রামবাসীদিগের সাধারণ জীবনে এই 'ভাগবত-ঘর' প্রতি সন্ধ্যায় স্বপ্নময় ও প্রেমময় রাজ্যের শুভবার্ত্তা প্রচার করিয়া থাকে। জগন্নাথ দাস প্রভৃতি সাধারণের চেষ্টায় বৈষ্ণবধর্ম্ম উড়িষ্যার আপামর-সাধারণের ধর্ম্ম হইয়াছিল। উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব যেরূপ কার্য্যকারী হইয়াছিল বঙ্গদেশে সেরূপ হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, বঙ্গদেশে সে সময় তান্ত্রিক উপাসনার বহুল প্রচার ছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ সকলেই তান্ত্রিক অনুষ্ঠানকেই তাঁহাদের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য বলিয়া গণ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যার আলোচনায় ও নৈয়ায়িকগণের প্রভাবে বঙ্গদেশবাসীর মস্তিষ্কের চালনা তখন যে পরিমাণে অধিক হইয়াছিল, সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের হৃদয়হীনতাও বাড়িয়া গিয়াছিল। জ্ঞানগরিমাশূন্য সরলবিশ্বাসী উড়িষ্যাবাসীর হৃদয়ে মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমময় সহজ সাধনার বীজ যেরূপ ও যত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া স্বর্গীয় কল্পবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল, তৎকালীন জ্ঞানপ্রধান বাঙ্গালীর হৃদয়ে উহা তত অল্প সময়ের মধ্যে কখনও সেরূপ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই বা পারিত না। এই পরিণাম ভাবিয়াই বোধ হয় মহাপ্রভু উড়িষ্যাকেই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর সময়ে বাংলাদেশে অনাচার ও কদাচারের স্রোত বহিতেছিল। পাঠানরাজশক্তি সে স্রোত রোধ করিবার প্রয়াস করেন নাই। বরং পাঠানশাসকদিগের প্রভাবে সেই স্রোতের বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতি প্রতাপরুদ্র দেবের শাসনকালে গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এই প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতির গতিরোধ করিতে বঙ্গ ও মধ্য প্রদেশের শাসকগণ কোন দিন প্রয়াস পান নাই। রাজা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর তাঁহার রাজ্যময় বৈষ্ণব প্রভাব অপ্রতিহত গতিতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ যে বৈষ্ণবভাব লইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন, যে বৈষ্ণবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ জগন্নাথদেবের বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দৈনিক বায়ান্ন প্রকার ভোগের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন,

সেই বৈষ্ণবভাব রাজা প্রতাপরুদ্র দেবে মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহাকে নররূপী নারায়ণে পরিণত করিয়াছিল। গঙ্গা-বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রতাপরুদ্র দেবের শাসনকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম উড়িষ্যার রাজা ও প্রজা উভয়েরই ধর্ম্ম হইয়াছিল এবং এখনও তদ্রূপ রহিয়াছে। চরম পরিণতি লাভ করিলেই অবনতি অবশ্যম্ভাবী। উপচয় ও অপচয় জাতীয়জীবনে আলো ও ছায়ার মত ঘন সন্নিবিষ্ট। যে ধর্ম্মভাব লইয়া গঙ্গাবংশীয়গণ উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন তাহার চরম উৎকর্ষের পর, গঙ্গাবংশের গৌরবরবি সহসা অস্তাচলে গমন করিল।

প্রতাপরুদ্র দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী, তাঁহার দুই পুত্রকে পর পর হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। শাসনযন্ত্র চালাইবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কয়েকটি দুর্ব্বল রাজা প্রায় ৩০ বৎসর বিশৃঙ্খল ভাবে শাসনযন্ত্র চালাইবার পর বিপ্লব ও অরাজকতা দেশব্যাপী হইয়া পড়িল। অবশেষে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট আকবর উড়িষ্যা দেশকে তাঁহার সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লইলেন।

হিন্দুশাসনের সময় উড়িষ্যার গ্রামগুলির কিরূপ অবস্থা ছিল, কিরূপে শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইত, এই সকল তত্ত্বনিচয় আজ পর্য্যন্ত সঠিক সংগৃহীত হয় নাই। এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে গভীর গবে-গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের আবশ্যক। সংক্ষেপে দুই-একটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রাজদরবারে রাজমন্ত্রী বা 'ব্যবর্ত্তার' উপর রাজ-কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি সকল বিষয়ে রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সন্ধি ও বিগ্রহের সময় তাঁহার অপরিসীম স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাঁহার কার্য্যের জন্য রাজা ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হইত না। রাজা যোগ্য হইলে মন্ত্রীর কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করিতেন। মূর্খ, দুর্ব্বল ও অক্ষম রাজারা মন্ত্রীর ক্রীড়নকস্বরূপ সিংহাসনে বসিয়া থাকিতেন মাত্র, রাজকার্য্যে তাঁহাদের কোনও রূপ কর্ত্তৃত্ব ছিল না। সে সময়ের মন্ত্রীগণ সাধারণতঃ বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না।

মন্ত্রীর নিম্নেই রাজসেনাপতির স্থান। যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে সৈন্য-সংগ্রহ ও সৈন্য-পরিচালনা করিতেন। কোন রাজার সহিত যুদ্ধ হইবে কি না, এই বিষয়ের চরম নির্দ্ধারণ মন্ত্রীর উপরেই নির্ভর করিত। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার পরক্ষণ হইতেই রাজ-সেনাপতি সমস্ত সেনার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া সামরিক অভিযানের পূর্ণনেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। যুদ্ধের ফলা-ফল তাঁহার উপরই নির্ভর করিত। যুদ্ধের সময় আবশ্যক অর্থ ও রসদের জন্য তাঁহাকে রাজদরবারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। সে সময়ের হিন্দু-রাজগণ দেশের অর্দ্ধেক খাস দখলে রাখিয়া অপরার্দ্ধ সৈনিক ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। পাইক বা সাধারণ সৈনিকগণ পুরুষানুক্রমে, পাইক জাইগীর ভোগ করিত। প্রত্যেক পরগণায় পাইক অর্থাৎ সাধারণ সৈনিকগণের উপরে এক-একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী বা 'খণ্ডায়েত' থাকিতেন। তাঁহার অধীনে যে সকল পাইক থাকিত, তাহাদিগের পরিচালনার ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত হইত। যুদ্ধের সময় এই সকল বৃত্তিভোগী খণ্ডায়েত নিজ নিজ এলাকাস্থিত পাইক-গণের রসদ লইয়া সেনাপতির অনুজ্ঞায় স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেন। প্রত্যেক খণ্ডায়েতের পরগণার ভিতর অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই তাহার প্রতিবিধান করিতে হইত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকেই দলবল লইয়া সজ্জিত হইতে হইত এবং বিনা যুদ্ধে পথ ছাড়িয়া দিলে তিনিই দণ্ডনীয় হইতেন। সামন্ত রাজা ও কিল্লাদারগণ যুদ্ধের সময় নিজ নিজ সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাঁহাদের সৈন্যের রসদসংগ্রহ ও পরিচালনার ভার তাঁহাদের উপরেই থাকিত। রাজার আদেশ দেশময় প্রচারিত হইলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু সজ্জিত সৈন্য রসদ সহ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সমবেত হইতে পারিত। রাজদরবারকে সেনা-দিগের রসদসংগ্রহের জন্য বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইত না। কিল্লাদার ও সামন্ত-রাজগণ প্রায় পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত রহিতেন বলিয়া তাঁহাদের সৈন্যগণ সর্ব্বদাই যুদ্ধক্ষম থাকিত; আরামপ্রিয় ও বিলাসী হইবার অবসর তাহাদের ছিল না।

রাজদরবারে রাজার আত্মীয়-কুটুম্ব ও অমাত্যগণ সকলেই বৃত্তি ভোগ করিতেন। তাঁহারা রাজার পার্শ্ব-চররূপে রহিয়া রাজার সহায়ক বন্ধুর ন্যায় রাজদরবারের সমস্ত কার্য্যে যোগদান করিতেন। কিল্লাদার এবং সামন্ত ও মিত্ররাজগণ অনেক স্থলে রাজপরিবারের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ থাকিতেন। তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব ছিলেন। এই সকল কিল্লাদার, আত্মীয়-বন্ধু, অমাত্য এবং সামন্ত বা মিত্ররাজ লইয়া রাজার পারি-বারিক ও সামাজিক জীবন গঠিত হইত। সে সময় হিন্দু রাজারা সকলেই বহু বিবাহ করিতেন, বহু পুত্র-কলত্র-লইয়া বাস করিবার ফলে রাজদরবারে সর্ব্বদাই নানা ষড়যন্ত্র চলিত। মিত্ররাজারা ও কিল্লাদারগণ মধ্যে মধ্যে সেই সকল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়িতেন। রাজদরবারে

রাজগুরুর প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। তিনি রাজার অন্তঃপুরে অবাধে গমনাগমন করিতেন বলিয়াই রাণী-মহলেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এই সব কারণেই রাজনৈতিক আবর্ত্তের বাহিরে থাকিয়াও পরোক্ষভাবে রাজগুরুর দ্বারা অনেক স্থলে গুরুতর ষড়যন্ত্র পরিচালিত হইত।

এক কথায়, মুসলমান ও ইংরাজ-শাসকগণ যেরূপ নিয়মাবলীর সৃজন করিয়া শাসনকার্য্যকে প্রণালী বদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন, হিন্দুরাজগণ শাসন-কার্য্যকে সেরূপ প্রণালীবদ্ধ করিতে পারেন নাই। রাজার ব্যক্তিগত চরিত্র, বল, সাহস ও কার্য্যদক্ষতার উপর তখনকার শাসন-যন্ত্রের কার্য্যকুশলতা সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করিত। প্রবল প্রতাপশালী রাজার পুত্র দুর্ব্বল হইলেই অতি অল্প দিনের মধ্যে শাসন-কার্য্য অচল হইয়া নানা বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্রে সমগ্র দেশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। হিন্দুরাজগণের সামরিক বিভাগ যেরূপ শৃঙ্খলা বদ্ধ ছিল, শাসনবিভাগ সেরূপ ছিল না; উৎকোচ-গ্রহণ, দীর্ঘসূত্রতা ও পক্ষপাতিত্ব বিচারবিভাগের চিরস্থায়ী কলঙ্কস্বরূপ ছিল। ফরিয়াদী 'ফরিয়াদ' দাখিল করিবার বহুদিন পরে, রাজদরবারের সুবিধা বা রাজার 'খাম-খেয়াল' মত বিচার-কার্য্য সম্পন্ন হইত। সে সময় দেওয়ানী বিভাগে খুব অল্পসংখ্যক ফরিয়াদ দাখিল হইত। আইনের বিধান অপেক্ষা রাজা বা মন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারই ন্যায়বিচারের মানদণ্ডস্বরূপ ছিল। তবে অধিকাংশ দেওয়ানী মোকদ্দমাই গ্রাম্য 'মোড়ল' মীমাংসা করিতেন। গ্রামগুলি হইতে নিয়মিত সময়ে রাজস্ব আদায় করা ছাড়া গ্রামের স্বাস্থ্য বা অপরাপর উন্নতির জন্য রাজদরবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী ছিলেন না। সমগ্র দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলা বা 'দণ্ডপাটে' বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দণ্ডপাটে এক-একজন বিষয়ী বা প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার অধীনে কয়েক জন খণ্ডায়েত ও একদল পাইক সৈন্য থাকিত। প্রত্যেক গ্রামে একজন চৌকিদার রাজদরবার হইতে নিযুক্ত হইত। চৌকিদার, পাইক ও খণ্ডায়েত দ্বারা 'বিষয়ী' দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। বিষয়িগণ শাসনবিভাগের নিম্নস্তরে অবস্থান করিয়া 'দণ্ডপাট' ও 'রাজদরবারের' মধ্যে সকল বিষয়েই সংযোগ স্থাপন করিতেন। তাঁহারা অধিকাংশ স্থলে পুরুষানুক্রমে জাইগীর ভোগ করিতেন।

রাজস্ববিভাগের সর্ব্বনিম্নে একজন 'ভুঁইমূল' বা নিম্নতম রাজস্বকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নিকট তাঁহার 'এলাকা'-স্থিত প্রত্যেক গ্রামের জমিজমা ও উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকা থাকিত। সেই তালিকা দৃষ্টে তিনি প্রতিবৎসর শস্য 'আমল' (সংগ্রহ) করিবার পর গ্রাম্য মোড়লের নিকট রাজস্ব 'তলব' করিতেন। সে সময় অধিকাংশ স্থলে ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্বরূপে গ্রহণ করা হইত। স্থানে স্থানে কড়ির প্রচলন ছিল। কড়ির বিনিময়ে জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয় হইত এবং টাকার পরিবর্ত্তে কড়ি দিয়াই লোকে রাজস্বের দায় হইতে মুক্ত হইত। গ্রামবাসীর নিকট হইতে ফস-লের পর মোড়ল রাজস্ব আদায় করিয়া রাখিতেন, এবং 'ভুঁইমূলের' তলবমাত্র রাজার পাওনাগণ্ডা বুঝাইয়া দিতেন। ভুঁইমূল ও গ্রামবাসিদিগের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল না। গ্রাম্য মোড়লগণ পুরুষানুক্রমে মোড়লী কার্য্য করিতেন। কিন্তু মোড়ল অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে কিংবা কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে গ্রামের মাতব্বরগণ প্রকাশ্যে মোড়ল নির্ব্বাচন করিতেন। সে সময় ভোট বা 'মতিগ্রহণ' করিবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্য দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে বা কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া মাতব্বরগণ এক বৈঠকেই সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে মোড়ল নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা যাহাকে মোড়ল বলিয়া নির্ব্বাচিত করিতেন, তাহাকেই সেই কার্য্য করিতে হইত। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে প্রস্তাবিত মোড়লের মতা-মতের অপেক্ষা করা হইত না। মাতব্বরগণকে সকলেই ভক্তিশ্রদ্ধা করিত এবং কেহই তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস পাইত না।

প্রতি গ্রামে অধিবাসিগণের সকল বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য ছিল। কোন কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না; জীবনযাত্রা তখন অতীব সহজ ছিল। বিলাস বা উপভোগের সামগ্রীর আড়ম্বর ছিল না। সহজ গ্রাম্য জীবনে যাহা কিছু আবশ্যক তাহা সমস্তই গ্রামের সীমার মধ্যে পাওয়া যাইত। গ্রামের চতুষ্পার্শ্ব বাঁশের নিরবচ্ছিন্ন জঙ্গলে আবৃত থাকিত। বহিঃশত্রু সহজে সেই জঙ্গল ভেদ করিয়া গ্রাম আক্রমণ করিতে পারিত না। সমস্ত গ্রামের যেরূপ একজন মোড়ল বা প্রধান থাকিতেন, সেইরূপ প্রতি জাতিরই এক-একজন প্রধান বা 'বেহারা' ছিল। বেহারাগণ জাতির সর্ব্ববিধ সামাজিক কার্য্যে উচ্চাসন লাভ করিতেন। তাঁহাদের অনুশাসন অমান্য করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। কোন জাতির মধ্যে সামাজিক ব্যাপার লইয়া গোলযোগ ও দলাদলি উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে বেহারাগণ তাহার মীমাংসা করিতেন। সামান্য সামান্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমাও তাঁহারা বিচার করিতেন; কেবল গুরুতর অপরাধে তাঁহারা স্বয়ং হস্তক্ষেপ না করিয়া গ্রাম্য মোড়লের বিচারই মানিয়া লইতেন। এইরূপে প্রত্যেক গ্রামেই একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন প্রতি-ষ্ঠিত ছিল। রাজদরবার যথেচ্ছাচারী হইলেও গ্রাম্য মোড়লের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। উৎপন্নের একষষ্ঠাংশ

কর দান করিয়া গ্রামবাসিগণ বহিঃশত্রুর আক্রমণে রাজসৈন্যের সহায়তা লাভ করিতেন। গ্রামের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারই, রাজদরবারের মুখাপেক্ষা না করিয়া স্বায়ত্তশাসনে যথাযথভাবে নির্ব্বাহিত হইত। আজকাল এরূপ হইলে দেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সীমাপরিসীমা থাকিত না। সম্বৎসরের দুইটী কিস্তিতে রাজস্ব প্রদান করিয়াই যদি উড়িষ্যাবাসী শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, তাহা হইলে দেশে পুনরায় রামরাজত্ব হইত।

আজকাল অবাধ বিদেশী বাণিজ্যের কৃপায় প্রত্যক্ষভাবে প্রায় এক টাকা রাজস্বের স্থলে দশ টাকা বিদেশী পণ্যে দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। গ্রাম্য মোড়ল ও বেহারাগণের সাদাসিধা বিচারপ্রণালীর পরিবর্ত্তে বহু সময়সাপেক্ষ কুট বিচারনীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার ফলে দেশের দারিদ্র্য ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। হিন্দুরাজত্বে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনপ্রথা সেই সময়েরই উপযোগী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে উহাই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া দেশব্যাপী স্বায়ত্তশাসনের সৌধ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। গ্রাম্য ও রাষ্ট্রীয় জীবনে হিন্দু রাজত্বকালে যে সকল নীতি অবলম্বিত হইত, তাহা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। মুসলমানগণ যখন উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান হিন্দুতীর্থকে বিধ্বস্ত করিতেছিলেন, সেই সময়েই উড়িষ্যার হিন্দুরাজগণ সে বিষয়ে দৃক্পাত না করিয়া অজস্র অর্থ ব্যয়ে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। উত্তরভারতের মুসলমানবিজয়ের স্রোত গিরি-অরণ্য বেষ্টিত উড়িষ্যাদেশে প্রথম অবস্থায় প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু কিছু দিন পরে সেই স্রোতের গতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া উড়িষ্যার হিন্দুরাজাকে রাজ্য ও সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নীতি ও শাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে উড়িষ্যার হিন্দুরাজগণ কোন দিন প্রচেষ্টা করেন নাই। এইরূপ করিলে বোধ হয় উড়িষ্যাকে অত অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদিগের অধীনতাপাশে বদ্ধ হইতে হইত না। নদী, গিরি ও অরণ্য ভেদ করিয়া মুসলমানগণ যখন উড়িষ্যায় প্রবেশ করিলেন, তখন হিন্দুদিগের হস্ত হইতে রাজদণ্ড আপনা হইতেই পড়িয়া গেল। রাজপুতগণ পাঠান ও মোগলের সহিত যেরূপ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, উড়িষ্যার হিন্দুরাজা বা উড়িষ্যাবাসিগণ তাহার শতাংশের একাংশও করেন নাই। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সহিত সামঞ্জস্য করিতে না পারা, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যেরূপ অমার্জ্জনীয় ত্রুটি, জাতি ও রাষ্ট্রবিশেষের পক্ষেও তাহা সেইরূপই গুরুতর ত্রুটি সন্দেহ নাই। উড়িষ্যায় আর্য্যপ্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আর্য্য ঔপনিবেশিক ও হিন্দুরাজগণ অনার্য্যদিগকে সমাজের বাহিরে অবজ্ঞায় ও তাচ্ছিল্যে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। দেশে আর্য্য ও অনার্য্য ভাবের সমন্বয়ে জীবন্ত সভ্যতা মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশ পাইবার কোন দিন অবকাশ পায় নাই। আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ এদেশে যে সভ্যতাতরু রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার মূল কোন দিন দূরসঞ্চারী হইতে পারে নাই। দেশের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সংঘাতে সেই তরু খর্ব্বাকার ও শুষ্ককাণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল। তাই, মুসলমান আক্রমণের প্রবল বাত্যায় হিন্দুগণ সহজেই নতশির হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাত্র একশত বৎসরকাল মুসলমানগণ উড়িষ্যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পর দিল্লীর মোগল সম্রাটগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে বহু দূরবর্ত্তী উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে মোগলপ্রভাব অপসারিত হইয়া অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই অরাজক অবস্থায় মারাঠা উড়িষ্যা দেশ দখল করিয়া লইলেন। উড়িষ্যার হিন্দুগণ সেই সময় মস্তক উত্তোলন করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, করিলে অবশ্যই সাফল্যলাভ করিতেন। যে সকল ভাবে ভাবিত হইয়া গঙ্গাবংশীয়গণ উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র দেবে সেই সকল ভাবের চরম পরিণতি। তাহার পর হিন্দুরাজগণ রাষ্ট্রে ধর্ম্মে ও সাহিত্যে ভাবহীন বিড়ম্বনাময় জীবন যাপন করিতেছিলেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইয়াছিল।

নীতি ও শিক্ষা।

(শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ)

শিক্ষাই মনুষ্যত্ববিকাশের একমাত্র বীজমন্ত্র। শিক্ষাবিহীন মানব মানবনামের অযোগ্য। মনুষ্যগণের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে বীজ অপরিস্ফুটরূপে বর্ত্তমান থাকে, শিক্ষাবারি সিঞ্চনে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া মনুষ্যকে ক্রমশঃ মানবীয় জীবনের উন্নতপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। মহামান্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাসমুচ্চয়ের মধ্যে শিক্ষার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"Education in its most comprehensive sense should aim at storing the mind of its recipient with useful knowledge, and training his powers of mind and body to healthful and harmonious action." শিক্ষা প্রত্যেক জাতির প্রাণস্বরূপ। সেই জন্যই সুদূরদর্শী

মহর্ষিগণ শিক্ষার এত অধিক মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগতে যত প্রকার জাতি আছে, জাতীয় লক্ষ্যের পার্থক্যানুসারে তাহাদের সকলেরই মন এবং প্রবৃত্তিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্যই প্রত্যেক জাতির শিক্ষার আদর্শ পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের দিকে যাঁহার প্রবৃত্তির গতি প্রধাবিত হয়, তাঁহার আদর্শ বাণিজ্যমূলক; শিল্পনৈপুণ্যে যাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে, তাঁহার আদর্শ শিল্পমূলক; রাজনৈতিক বিষয়ে যাঁহার প্রবৃত্তি হয়, তাঁহার আদর্শ রাজনৈতিক-ভাবপ্রধান হইবে। ধর্ম্মহীন ভৌতিক বিজ্ঞানোন্নতির সহিত ঐ সমস্ত শিক্ষার দৃঢ় সম্বন্ধ থাকায় উহার দ্বারা যথার্থ আত্মোন্নতি হইতে পারে না। ধর্ম্ম আর্য্যজাতির প্রাণস্বরূপ, সেজন্য তাঁহাদের প্রবৃত্তির ধারা সচ্চিদানন্দ মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে; সুতরাং যে শিক্ষার মূলে ধর্ম্ম নাই, আর্য্যগণের মতে সেই শিক্ষা জাতীয় জীবনের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। আর্য্যজাতিগণের লৌকিক অর্থাৎ ব্যবহারিক শিক্ষাও ধর্ম্মপ্রবণতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

কালের প্রভাবে আর্য্যজাতির ধর্ম্মশিক্ষা লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ধর্ম্মহীন প্রতীচ্য শিক্ষার বিষময় ফলে আর্য্য-জীবন পুরাতন আর্য্য আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, পরি-বর্দ্ধিত বা পরিপুষ্ট হইতেছে না। আধুনিক স্কুল-কলেজে কোমলমতি বালকগণ যে শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষার পূর্ণ অভাব থাকায় তাহারা নিজ নিজ জীবন আর্য্যগণের আদর্শানুসারে গঠিত করিতে পারিতেছে না। বালকগণ প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট, আচারভ্রষ্ট এবং চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া নিজেকে এবং স্বীয় জাতীয় জীবনকে যথার্থ উন্নতির সুপ্রশস্ত পথ হইতে অনেক দূরে লইয়া যাই-তেছে। সদাচারপ্রতিপালন, পিতৃমাতৃভক্তি, সচ্চরিত্রতা, জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা, আস্তিকতা, পরার্থপরতা, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি আর্য্যজাতিসুলভ গুণগুলি ধর্ম্মহীন শিক্ষার প্রভাবে আর্য্যসন্তানের হৃদয় হইতে ক্রমশঃ অপসারিত হইতে চলিয়াছে।

আর্য্যজাতির প্রধান ধর্ম্ম 'সদাচার'। সদাচারপাল-নের দ্বারা মানব আধিভৌতিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত নিজ জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়। সদাচার প্রতিষ্ঠিত হইলেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠান ও মৌলিক আলম্বন দৃঢ় ও সবল হয়। সদাচার শিক্ষা করিতে হইলে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। নীতিশিক্ষার দ্বারা মনোরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। যাঁহার নৈতিক জীবন উন্নত, তিনি মনুষ্যত্বের উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়া দেবত্বের অধিকারী হইয়া থাকেন। এইরূপ যে জাতির মধ্যে নৈতিক জীবন উন্নত না হয়, সে জাতি কখনই জাতীয়তার উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে পারে না। তাহার যদি কোন প্রাচীন গৌরব বা প্রতিষ্ঠা থাকে, তাহাও নৈতিক জীবনের অব-নতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। জীবনসংগ্রামের কঠিন সমস্যায় নৈতিক উন্নতিহীন জাতি বা ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তও স্থিরতালাভ করিতে পারে না। তরঙ্গায়িত সংসারপ্রবাহিনীর ভীষণ আবর্ত্তে শীঘ্রই ঈদৃশ জাতি বা ব্যক্তি বিনাশের অতল জলে নিমগ্ন হইয়া যায়। এজন্য নৈতিক জীবনের অনুশীলন করা আদৌ অর্থাৎ সকল কর্ম্মের প্রারম্ভে উচিত ও বিহিত।

প্রথমতঃ, চরিত্র বিশুদ্ধ না হইলে মানুষ জীবনে কোন উন্নতিই লাভ করিতে পারে না। এজন্য চরিত্রই যাব-তীয় নৈতিক উন্নতির প্রধান উপাদানস্বরূপ। মনুষ্য-মনের স্বাভাবিক গতি নিম্নদিকে। উদ্দাম ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই মনুষ্যকে ভোগের দিকে, পাপের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। সেইগুলিকে সংযত করিয়া ক্রমশঃ ত্যাগ, সংযম ও পরমাত্মার দিকে নিয়োজিত করিতে পারিলেই চরিত্রনাশের আশঙ্কা দূরীভূত হয় এবং মনুষ্য সচ্চরিত্র হইয়া নৈতিক জীবনে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, শরীর বাক্য বা মনের দ্বারাও কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিলেই হিংসা করা হয়। সংসারে হিংসার তুল্য পাপ নাই এবং অহিংসার মত পুণ্য নাই। সংসারকে শ্মশানরূপে না দেখিয়া সুষমামণ্ডিত দেখাতেই বিশেষ আনন্দ আছে। শরীর, মন ও বচন দ্বারা অহিংসার অভ্যাস করিলে হিংসাভাব আদৌ জাগ্রত হয় না; তখন উক্ত অহিংসাব্রতসিদ্ধ যোগীর সম্মুখে হিংস্রজন্তু আসিলেও হিংসা ভুলিয়া গিয়া যোগীর অনিষ্ট করিতে পারে না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির দ্বারা সংসার নির্ম্মিত হওয়ায় প্রত্যেক জীবের মধ্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটী গুণ অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে। সঙ্গের আকর্ষণে বা অনুকূল শক্তির আকর্ষণে তত্তৎগুণের উদয় হইয়া থাকে। এই জন্য মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—'অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে' অর্থাৎ জীবগণের প্রতি অহিংসাপরায়ণ হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়; যিনি সকল জীবকে অভয় দিয়া থাকেন কোন জীব হইতেই তাঁহার ভয় বা অনিষ্টাশঙ্কা থাকে না। ইহা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার সামান্য পরিচয়স্বরূপ।

তৃতীয়তঃ, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। 'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা' অর্থাৎ পরমাত্মা তপস্যা এবং সত্যের দ্বারাই প্রাপ্য হইয়া থাকেন ইহাই বেদোক্তি। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে সত্যধর্ম্মের সমধিক প্রতিষ্ঠা ও আদর ছিল; কেবল সত্যধর্ম্মের আশ্রয়েই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অক্ষয় স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করিতেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার ফলসম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্'—সত্যের প্রতিষ্ঠা হইলে তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ক্রিয়া ফলবতী হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি বাক্যে অথবা মনে কিংবা অন্য কোনরূপেই মিথ্যা প্রয়োগ করেন না, বরং সত্যই বলিয়া থাকেন, তাঁহার মধ্যে এইরূপে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইলে তিনি যাহা বলেন তাহাই সত্য হইয়া যায়; কারণ তপস্যার দ্বারা যে অঙ্গের সংযম করা যায় তাহারই শক্তি বাড়িয়া থাকে। শাস্ত্রে সত্যের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে 'সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তম্' যাহাতে জীবগণের হিতসাধন হয় তাহাই সত্য। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"

চতুর্থতঃ, চুরি অর্থাৎ চৌর্য্যবৃত্তির ন্যায় নীচকার্য্য সংসারে আর নাই; কারণ একমাত্র এই স্তেয়বৃত্তি অভ্যস্ত হইলে মনুষ্য অনেক প্রকার পাপে লিপ্ত হইতে পারে। ইহা ভগবানের চিরন্তন নিয়ম যে, অন্যায়োপার্জিত দ্রব্য কখনও ভোগে আসে না। মহর্ষি পতঞ্জলি অস্তেয় প্রতিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া কহিয়াছেন—"অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্"; অর্থাৎ অস্তেয়বৃত্তির প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হইলে সকল রত্নের স্বতঃপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইয়া উঠে। যিনি কখনও চৌর্য্য অবলম্বন না করিয়া তপোবলে অস্তেয় ভাবকে নিজের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি না চাহিলেও অযাচিতভাবে সকল ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পঞ্চমতঃ, 'কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে' কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে, 'ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ' কাম ত্যাগ করিলেই ক্রোধনাশ হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই সদুক্তি শ্রবণ করিয়া সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যে ব্যক্তি যে বস্তুটি কামনা করে, উহা তাহার মনের মত। সে যদি উহা না পায় অথবা পাইলেও আবার কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেই তাহার ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই জন্য ক্রোধের নাশ করিতে হইলে কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। মনের মধ্যে ক্রোধের উদয় হইলে সমস্ত শরীরের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হইয়া উঠে, রক্ত গরম হয়, শ্বাস বেগে বহিতে থাকে এবং ক্রোধরিপুর তাড়নায় মানুষের শান্তি নষ্ট হয়। এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উত্তেজনার বিষম প্রতিক্রিয়ায় তাহার শরীর রুগ্ন দুর্ব্বল ও কৃশ হয়, মন খারাপ হয় এবং শ্বাসের ক্ষয়ে আয়ুও কমিয়া যায়। বন্ধুবিচ্ছেদ, কলহ, হত্যা ইত্যাদি সবই ক্রোধের বশে হইতে পারে। বিদ্যুতের জ্যোতির মত সামান্য ক্ষণের জন্য সংসারকে আলোকিত করিতে আসিয়া আমাদের অশান্তি ও কলহের মেঘমালা বিস্তার করা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে প্রেম, আনন্দ ও শান্তির সহিত দিনগুলি কাটিয়া যায়, তাহার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।

ষষ্ঠতঃ—

"লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণম্॥"

লোভ হইতে ক্রোধ, কাম, মোহ ও পাপ সবই উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোভ এক প্রকার কামনা, চিত্তের অত্যন্ত আকর্ষণ হইলেই কামনার উদয় হইয়া থাকে। লোভের ত্যাগ সম্বন্ধে ভাগবত বলিয়াছেন—"অর্থানর্থেক্ষয়া লোভম্" ইষ্ট ও অনিষ্টের বিচার হৃদয়ে জাগ্রত থাকিলে লোভ ত্যাগ করা যায়। বিচারবুদ্ধি ব্যতীত লোভত্যাগের আরও দ্বিবিধ উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রথম উপায় প্রসাদবুদ্ধিতে ভোজন করা, অর্থাৎ ভোজ্যদ্রব্য সম্মুখে আসিলেই প্রথমতঃ উহা ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করা উচিত। মনে করিতে হইবে, তিনি যেন উহা গ্রহণ করিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন এবং আমি তাঁহার ঐ প্রসাদ ভোজন করিতেছি। এইরূপে সর্ব্বত্র প্রসাদবুদ্ধি উৎপন্ন হইলে ভোগবুদ্ধি কমিয়া যাইবে এবং তাহাতে লোভও শান্ত হইবে।

লোভত্যাগের দ্বিতীয় উপায় মধ্যে মধ্যে উপবাস করা; স্বাস্থ্যের কল্যাণবিধানমানসে হিন্দুশাস্ত্রে ইহা প্রকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রিয়বস্তুকে মধ্যে মধ্যে পরিত্যাগ করিবার অভ্যাস করিলে অথবা উহা ত্যাগ বা দান করিলে উহার উপর আসক্তি বাড়িতে পারে না। কারণ সংসারে সমস্ত কাম্য বস্তু অধিক সংসর্গের দ্বারাই কামনাকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। শাস্ত্রে যথার্থই বলা হইয়াছে;—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

সপ্তমতঃ, দয়ারবৃত্তির ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। দুঃখ দেখিয়া কাতর হওয়াকে দয়াবত্তা কহে। দয়া মানুষী বৃত্তি নহে, পরন্তু ঈশ্বরীয় বৃত্তি আমরা করুণাময় ভগবানের মধ্যেই নিষ্কারণ করুণা অথবা অহৈতুকী দয়া দেখিতে পাই। তাঁহার করুণার প্রবাহ আলোর মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের প্রাণ রক্ষা করিতেছে। তাঁহার করুণার অসীম রশ্মি সূর্য্যকিরণরূপে অজস্র ধারায় বিকীর্ণ হইয়া জগদ্যন্ত্রের মধ্যে সঞ্চারিণী শক্তি প্রদান করিতেছে। তাঁহার করুণার ধারা বর্ষাকালীন মেঘের ধারায় বর্ষিত হইয়া শস্য-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে এবং প্রবাহিনীর অনন্ত প্রবাহরূপে জগতে জীবন দান করিতেছে। আমরা ভগবানকে কি দিয়াছি যে তিনি আমাদের জন্য এত দয়া দান করেন? ইহাই লৌকিকী বুদ্ধি, কারণ মানুষ দানের

প্রতিদান আশা করিয়া থাকে। কিন্তু দয়া করা তাঁহার স্বভাব, তাই নিরপেক্ষভাবে সদাই তিনি জীবের প্রতি দয়া বিস্তার করেন। আমরা নিজের হৃদয়ে এই দয়া ভাবকে যতই উদ্বুদ্ধ করিব, ততই ভগবান্ আমাদের অন্তরে জাগিবেন। ঈশ্বরের দয়াগুণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া মানুষ ঈশ্বরতুল্য হইয়া যায়; তাহার অনুদার বা স্বার্থমূলক কোন নীচভাবই আর থাকে না। তাহার হৃদয়ে প্রবাহবতী করুণাগঙ্গা ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে এবং পরিশেষে অনন্ত করুণাময় করুণাসিন্ধু ভগবানে গিয়া লয়প্রাপ্ত হয়। তখন মানুষ জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া 'সত্য শিব সুন্দরের' ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সর্ব্বদা পরের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করে, পরকে আপন করিয়া দেখিতে শিখে ও পরের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হইতে শিক্ষা করে তাহার নিজ সুখের স্পৃহা, বাসনা অথবা লালসা সমূলে বিনষ্ট হয়, নিজ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহের ভোগবিলাস ও তৃপ্তিকামনা উন্মূলিত হইয়া যায় এবং এইভাবে অনায়াসেই তাহার সংযম ও জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হইয়া থাকে। এইরূপে অন্যের প্রাণের সহিত নিজের প্রাণকে মিশাইতে শিখিলে নিজের প্রাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া বিশ্ব প্রাণের সহিত মিলিত হয়। সংসারে পরোপকার দ্বারা যেরূপ নির্ম্মল আনন্দ পাওয়া যায়, সেরূপ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। দয়া দাতা এবং গ্রহীতা উভয়কেই পবিত্র করে, নির্ম্মল করে, আনন্দিত করে। ইহাই যথার্থ দেবভাব। নরজগতে দেবত্ব লাভ করিতে হইলে এই দয়ারূপিণী দিব্য বৃত্তির অবশ্যই শরণ লওয়া উচিত।

দয়াবৃত্তি মানবহৃদয়ের স্বার্থভাবকে ক্রমশঃ বিস্তৃত বা প্রসারিত করিয়া দেয়। বুঝিবার সুবিধার জন্য স্বার্থকে চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা—স্বার্থ, পরমার্থ, পরোপকার, এবং পরমোপকার। নিজের ভৌতিক সুখসাধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত যাহা কিছু সমস্তই পুরুষার্থ বা স্বার্থশব্দবাচ্য। এই স্বার্থ যখন পারলৌকিক সুখকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে পরমার্থ বলে। ইহলোকে পুণ্য করিয়া, দান করিয়া, সকাম তপস্যাদি ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্য পরমার্থ লাভ করে; এবং এই পরমার্থবলেই মৃত্যুর পর পরলোকে তাহারা স্বর্গাদি সুখভোগে সমর্থ হয়। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে স্বার্থ ও পরমার্থ উভয়ই ব্যক্তিগত; কিন্তু জীবহৃদয় যখন উদার হইয়া পরের সুখে সুখী হইতে শিখে, পরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে শিখে, পরের দুঃখে দুঃখাবনত হইয়া আত্মোৎসর্গ করিতে শিখে, তখন তাহার এই স্বার্থ অত্যুদার ভাব ধারণ করিয়া পরোপকার ও পরমোপকারের পবিত্র হোমানলে আহুতি প্রাপ্ত হয়। এই আত্মোৎসর্গ যখন কেবল সমষ্টিজীবের ইহলৌকিক সুখের জন্য নিষ্পন্ন হয়, তখন তাহাকে পরোপকার বলে এবং যখন পারলৌকিক সুখের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অনুষ্ঠিত হয় তখন তাহাকে পরমোপকার বলে। অতএব ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পরমার্থ অপেক্ষা সমষ্টিজীবকল্যাণকর পরোপকার ও পরমোপকারের মহিমা খুব বেশী। আমরা মানবজীবনে যতই পরোপকার ও পরমোপকারের মহিমা বুঝিতে পারিব ততই আমাদের স্বার্থভাব সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ হইবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময় উদারতা ও দেবভাবের পূর্ণ বিকাশ হইয়া আমাদের মানব জীবন চরিতার্থতা লাভ করিবে।

মুক্তিবাদ।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এ)

দেহাত্মবাদের বিরোধ করিয়া দেবতাবাদ, দেবতাবাদের বিরোধ করিয়া ঈশ্বরবাদ ও ঈশ্বরবাদের বিরোধ করিয়া মুক্তিবাদ বা মোক্ষবাদ জীবচিত্তে উত্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে জীবকে উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্ষেত্রে উপনীত করে। বাস্তবিক পক্ষে, মোক্ষবাদ মানবচিত্তকে এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করায়। যত দিন মন বহির্বস্তুতে আকৃষ্ট থাকে, যত কাল মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত বিষয়ভোগে নিবিষ্ট থাকে, যত কাল মন সুখময় বিষয়ভোগকেই তাহার একমাত্র গতি বলিয়া বুঝে ও জানে, ততকাল সে ইহলোক হইতে দেবতালোক, দেবতালোক হইতে ঈশ্বরলোক পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া সেই সুখভোগকে অনন্তকালের জন্য স্থিতিদান করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু দুঃখও যেমন 'জগৎ' অর্থাৎ গতিশীল (গম্ ধাতু), সুখও তেমনি জগৎ। সুখরূপ জগতের সহিত যতই কেন সদ্ভাব ও আত্মীয়তা স্থাপন করিতে প্রয়াস কর না, সে একদিন না একদিন তোমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবেই, কারণ চিরস্থায়ী হইবার শক্তি তাহার নাই। এইরূপে সুখের সহিত মিলনের পর বিচ্ছেদ এবং দুঃখের পর দুঃখের ঘোর কশাঘাত ভোগ করিতে করিতে জীবের অভিজ্ঞতা ঘনীভূত হইতে থাকে। ক্রমেই তাহার চিত্তে এই ধারণা উন্মেষিত হইয়া দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে যে, সে যাহা চায়—চিরতরে দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি—তাহা সুখের পথ দিয়া আসিবে না, ভোগের পশ্চাতে ছুটিলে পাওয়া যাইবে না।

এদিকে ইহলোকের অতি স্থূল, অতি মূঢ় উপস্থিত ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে মার্জ্জিত, নিয়মিত, শাসিত ও পরাহত করিয়া দেবতালোক ও ঈশ্বরলোকের সূক্ষ্ম

হইতে সূক্ষ্মতর, শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর ভোগের জন্য যে নিরন্তর প্রয়াস করিতে হয়, সেই প্রয়াসের ফলে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা অনেক কমিয়া যায়। যে চিত্তে একদিন এই স্থূল দেহের সুখ-দুঃখের, স্ত্রী-পুত্রের, গৃহ-পরিবারের, ব্যবসায়-বাণিজ্যের, মনিকাঞ্চনের, আধিব্যাধির ভাবনা ভিন্ন অন্য কিছু স্থান পাইত না, সেই চিত্ত এখন এ সকলকে অনেক পরিমাণে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছে। সে অদ্যাপি ভোগ চাহিলেও উহা দেবতার ভোগ—যে ভোগ প্রভূতরূপে হিংসাদ্বেষ-বর্জ্জিত, পাপশূন্য—যে ভোগ-অর্জ্জনে পরপীড়া নাই, পরপ্রীতি আছে—যে ভোগের আত্মপ্রসাদে সেবা-লাভের প্রসাদ অপেক্ষা সেবাদানের প্রসাদ অধিক। দেবতালোক বা ঈশ্বরলোক লাভের প্রয়াসে মনশ্চক্ষুকে নিরন্তর ইহলোকের গণ্ডী ছাড়াইয়া পরলোকে সম্প্রসারিত করিতে হয়, দু'দিনের স্থূল দেহকে খাটো করিয়া বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত অন্তরস্থ ইহপরলোকগামী সূক্ষ্মদেহে নিবিষ্ট করিতে হয়। বাসনার ক্ষেত্র তখন ক্ষুদ্র, অতি স্থূল, মলাময় মানবদেহ না হইয়া দেবলোকের মহত্তর সূক্ষ্মতর পবিত্রতর দেবোপম দেহ হয়। এরূপ দেহ শুদ্ধ বাসনারই লীলা-ক্ষেত্র হইতে পারে—অশুদ্ধ বাসনার নহে। এরূপ দেহে দৈবী বাসনারই ভোগ হইতে পারে, পাশবিক আসুরিক বাসনার নহে।

পুরাণে এই কথাটি অতি সুন্দররূপে নহুষের উপাখ্যানে উপদিষ্ট হইয়াছে। নহুষ রাজা বহু পুণ্যের ফলে ইন্দ্র হইয়া ত্রিজগতের আধিপত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখনই তাঁহার চিত্তে পাপময় আসুরিক ভোগলালসা জাগিয়া উঠিল, তখনই তাঁহার দেবদেহ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং তিনি অতি নিকৃষ্ট অজগরদেহ প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ জীবের চিত্তের গতি অনুসারে তদনুকূল বাহ্যদেহ আবির্ভূত হয়। ব্যাঘ্রের বাসনা ব্যাঘ্রের দেহেই ভোগ হইতে পারে, সুতরাং কোন জীবের চিত্তে যখন ব্যাঘ্র-বাসনা ফুটিয়া উঠে, তখন সে ব্যাঘ্র হয়। সেই চিত্তে যদি কখনও মানবীয় বাসনা ফুটিয়া উঠে তখন আবার সে মানব হইবে, দৈবী বাসনা ফুটিলে দেবতা হইবে। বাসনা যত নিকৃষ্ট অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ স্বার্থময় ও পরপীড়াদায়ক হইবে, বাহ্য দেহ তত অধিক স্থূল জড় ও দুঃখদায়ক হইবে; বাসনা যত উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মার্জ্জিত ও প্রসারিত-স্বার্থমুখী, পরপ্রীতিময় ও করুণা-ব্যঞ্জক হইবে, বাহ্যদেহও তত সূক্ষ্ম ও সুখদায়ক হইবে। মলিন, পরপীড়াদায়ক বাসনা চিত্তে পোষণ করিয়া ও তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া দেবলোকাদি উচ্চতর সুখভোগের ক্ষেত্রে জীবনলাভের ইচ্ছা জলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করিয়া পিপাসাতৃপ্তির ইচ্ছার ন্যায় বাতুলতা মাত্র, এবং পরিণামে ঘোর দুঃখের মূল। মানব যেমন ব্যাঘ্র অপেক্ষা করুণাপর, দেবতা বা ঈশ্বর তেমনি মানব অপেক্ষা অনন্ত গুণ করুণা-পর। যে মানব নিজে দুঃখে পতিত হইয়া বা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া কাতর কণ্ঠে দেবতা ও ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করিয়া সেই দুঃখ বা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে চাহে, সে কোন্ প্রাণে, কোন্ সাহসে, কোন্ নীতিতে অপরকে দুঃখ দিয়া, অপর প্রাণী বধ করিয়া সেই দেবতাকে তুষ্ট করতে প্রয়াস পাইবে? এরূপ প্রয়াসের ফলে যিনি তুষ্ট হইবেন তাঁহাকে দেবতা বলা যায় না, এবং তাঁহার সন্তোষে জীবের কল্যাণও সম্ভবপর নহে।

যাহাদের চিত্ত বহুল পরিমাণে বিশুদ্ধ হয় এবং সেই চিত্তশুদ্ধির ফলে যাহারা জগতের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করে, তাহারা জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে অভিনব এক অভিজ্ঞতা লাভ করে। তাহাদের উন্মীলিত মানসচক্ষু দেখিতে পায় যে পূজা-উপাসনা প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা যে সকল লোক লাভ হয়, উহারা কখনও নিত্য হয় না। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন"—মু. উ. ১।২।১২—কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত লোক সকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ এই নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করেন যে, কৃত কর্ম্মের দ্বারা অকৃত অর্থাৎ নিত্যপদার্থ লাভ হয় না। এখানে বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে যে, শ্রুতি ব্রাহ্মণের অর্থাৎ ব্রহ্মাভিমুখী চিত্তের এই বৈরাগ্যকে পরীক্ষামূলক বলিয়াছেন। এই বৈরাগ্য তাহার স্বাভাবিক। যেরূপ প্রদীপ জ্বালিলে গৃহ স্বতই আলোকিত হয়, সেইরূপ যথাযথ ভাবে জগতকে পরীক্ষা করিতে পারিলে চিত্তে স্বভাবতই এই বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই পরীক্ষা সকলে করিতে পারে না, সুতরাং বৈরাগ্যও সকলের হয় না। এখানে পরীক্ষার বিষয়—ইহলোক ও পরলোক, মনুষ্যলোক দেবলোক ও ঈশ্বরলোক, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অখণ্ড জগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সমগ্র সৃষ্টি। যে চিত্ত এই বিশাল বিষয়ের দোষগুণের, নিত্যত্ব-অনিত্যত্বের পরীক্ষক হইবে তাহারও বিশাল হওয়া চাই। ক্ষুদ্র স্বার্থে, ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখে, ক্ষুদ্র শোকমোহে, ক্ষুদ্র লাভালাভে, ক্ষুদ্র দেহের ভোগবাসনায় আবদ্ধ অন্ধ চিত্ত এ পরীক্ষক হইতে পারে না। ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহত্তের দিকে যে চিত্ত জাগিয়াছে সেই ব্রাহ্মণচিত্তই এইরূপ পরীক্ষক হইতে পারে।

একটি দৃষ্টান্ত দিই। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে যাহার সন্তান হইয়াছে, সে একেবারে সংসারে বিজড়িত ও আবদ্ধ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে যদিও একটু-আধটু ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিত, সাধুসন্ন্যাসীর আনাচে কানাচে ঘুরিত, রামায়ন-মহাভারতটা আওড়াইত, কখনও বা বন্ধু-বান্ধবের কাছে 'আমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইব' বলিত এবং গৃহে মায়ামুগ্ধ মা-বাপের মনকে ঐ কথা বলিয়া আঁতকাইয়া

দিত; কিন্তু এখন আর তাহার নড়িবার উপায় নাই, খোকাখুকীদের লইয়াই ব্যস্ত; তাহাদিগকে কোলেকাঁকে লইয়া বেড়ান, তাহাদের রোগপীড়ায় ডাক্তার বৈদ্যের বাড়ীতে ছুটাছুটি, তাহাদের খাওয়াপরার জন্য টাকা রোজকার, সংসারের এই ঘূর্ণীচক্রে পড়িয়া তাহার আর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে না—যেন ২৪ ঘণ্টার দিন ৪৮ ঘণ্টায় হইলে ভাল হয়। তখন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, মা-বাপে বলে—'ছেলেটার মন 'উড়ু' 'উড়ু' ছিল, এখন ছেলেপিলে হইয়া ঘরপোষা হইয়াছে'। বাস্ নিশ্চিন্ত, পাখী বাঁধা পড়িয়াছে—অনন্ত আকাশে উড়িবার সাধ্য আর তাহার নাই। চিত্ত তাহার সঙ্কীর্ণ গৃহের কোণে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পুত্রকন্যা তাহার গলায় শৃঙ্খল বাঁধিয়াছে। মুক্তির পথ তখন সুদূরপরাহত। জগন্নাট্যের এই এক দৃশ্য।

আবার এক দৃশ্য দেখ। রাজপ্রাসাদ। মণিময় প্রদীপমালা বৃহৎ প্রকোষ্ঠকে আলোকিত করিয়া আছে। রাজবধূ সোনার পুতলী কোলে লইয়া নিদ্রামগ্ন। পর্য্যঙ্কের পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট হইয়া তরুণ রাজপুত্র ঘোর চিন্তামগ্ন। এক-একবার পুত্রমুখপানে চাহিতেছেন, আবার গবাক্ষদ্বার দিয়া বিশাল পৃথিবীর দিকে, অসীম আকাশের দিকে—যেন বিশ্বের পরপার পর্য্যন্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। একবার ভাবিতেছেন, এমন স্ত্রী ও সন্তানকে কি ফেলিয়া যাওয়া যায়? আবার চিত্তের গভীরতম প্রদেশ হইতে আহ্বান আসিতেছে—"কুমার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকাও; অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত জীব কি অনন্ত দুঃখই পাইতেছে। এ দুঃখের কি শেষ হইবে না? অনন্ত দুঃখ ভোগ করাই কি জীবের স্বভাব? তাই যদি হয়, তবে কোন্ সুখের আশায় স্ত্রীপুত্রের, রাজৈশ্বর্য্যের, ভোগবিলাসের নিকট আবদ্ধ থাকিবে? দেখ—দেখ—কুমার, বিশ্বময় কি হাহাকার! পুত্রশোকে পিতামাতা ক্রন্দন করিতেছে, পতিশোকে স্ত্রী ম্রিয়মাণা, পিতৃমাতৃশোকে পুত্রকন্যা আকুল, রাজ্যশোকে রাজা ব্যাকুল, যৌবনের শোকে বৃদ্ধ মুহ্যমান—মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু—জগৎ মৃত্যুতে ঘেরা, মৃত্যুতে ঢাকা, মৃত্যুময়। কুমার, এই জগতে সুখের আশায় ঘরের কোণে বসিয়া থাকিবে? দেখিবে না—এ মৃত্যুর, এ দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি কোথায়?" বিশাল চিত্ত ফুটিয়া উঠিল—পড়িয়া রহিল যশোধারা, পড়িয়া রহিল সুকুমার শিশু, পড়িয়া রহিল রাজ্যপাট, পড়িয়া রহিল যৌবনের ভোগসুখ। মহামন বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িল, বিশ্বের দুঃখের মীমাংসা করিতে ছুটিল।

গৌতমের বিশাল চিত্ত ত্রিভুবন পরীক্ষা করিয়া নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নিমাই মহাপণ্ডিত—নবদ্বীপে তাঁহার টোলে ছাত্র ধরে না; অনেক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে পরাজিত করায় তাঁহার গৌরব দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গৃহে প্রেমময়ী ভার্য্যা, নয়নোল্লাসকর পুত্র। কিন্তু যখন তাঁহার বিপুল চিত্ত বিপুল জগতকে পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইল, তখনই তিনি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রেমাশ্রুবিগলিত-নেত্রে ঊর্দ্ধবাহু স্খলিতবসন নিমাই, সমস্ত ত্যাগ করিয়া জীবের দুঃখ বিমোচনার্থ বিশ্বপাবন পাপ-নাশন হরিনাম দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিলেন।

এইরূপে যে মহাপুরুষই সমগ্র জগতকে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারই অন্তর্দ্দৃষ্টি জগতের বাহ্য চাকচিক্যে ভোগলালসায় আবদ্ধ না থাকিয়া অন্তরস্থ অসীম দুঃখপ্রবাহে পতিত হইয়াছে, তিনিই নির্ব্বেদ লাভ করিয়াছেন। তিনিই দেখিয়াছেন যে, কর্ম্মচিত অর্থাৎ কর্ম্মার্জ্জিত কোন লোকেই দুঃখের অবসান নাই। কর্ম্মই যে কোন লোকে জন্মমৃত্যুর হেতু। জীব যে কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার ফলভোগের জন্যই সে দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করে; সুতরাং কর্ম্মজন্যই দেহ। কর্ম্ম সসীম, আদ্যন্তবিশিষ্ট, দেহ ও মনের সাময়িক ব্যাপারমাত্র—কাজেই উহা অসীম ফল দান করিতে পারে না। যে লোকের, যে দেহের কর্ম্মজন্যতা আছে তাহা আদিমান্, সুতরাং অনন্ত হইতে পারে না—অনন্তের একপ্রান্ত সান্ত বলা বাতুলতামাত্র। দিহ্ ধাতু হইতে দেহশব্দ। দিহ্ ধাতুর অর্থ উপচয় বা বৃদ্ধি। যাহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে তাহাই দেহ। অনন্তের হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই সম্ভব নহে। পুনশ্চ, পরিচ্ছিন্নতাই দেহ। পদার্থের সঙ্ঘাত দ্বারাই পরিচ্ছিন্নতা হয়। এই সঙ্ঘাত কতকগুলি পদার্থকে একত্রিত পুঞ্জীকৃত করিয়া অন্যান্য পদার্থের সহিত তাহার পার্থক্য সম্পাদন করে। এই সংহত পদার্থপুঞ্জই দেহ। ইহা তদতিরিক্ত পদার্থভোগে জীবের সাধন হয়, অর্থাৎ জীব দেহরূপ পদার্থপুঞ্জের সাহায্যে তদ্বহির্ভূত পদার্থকে ভোগ করে। এখন, কতকগুলি পদার্থকে সংহত করিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন। দেহের সংহননে এই শক্তি কি? বিজ্ঞান হইতে জানা যায় যে, কতকগুলি ভূতের রাসায়নিক ও যৌগিক সংহননের দ্বারা দেহ সৃষ্টি হয়; কিন্তু স্বভাবতঃ আকর্ষণ ও বিকর্ষণশীল ভূতসকলের বিশেষ বিশেষ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ হইয়া বিশেষ বিশেষ দেহের সৃষ্টি কেন হয় তাহা পদার্থবিজ্ঞানের বিষয় নহে।

ইহার জন্য মনোবিজ্ঞানে যাইতে হইবে। সেখানে গেলে আমরা প্রথমেই ধরিতে পারি যে, যে দেহের দ্বারা যে ভোগাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই ভোগাদির প্রয়োজনই সেই দেহসংহননের শক্তি। সেই ভোগাদি যত শেষ হইয়া আসে এই শক্তিও তত ক্ষীণ হইতে থাকে। অবশেষে সেই ভোগাদির অবসান হইলে এই শক্তিরও অব-

স্নান হয়, এবং দেহের অসংহনন বা মৃত্যু হয়। সসীম দেহের সৃষ্টির পশ্চাতে অসীম প্রয়োজনরূপ শক্তি থাকিতে পারে না, সে শক্তিও সসীম হইবে এবং তাহার ক্ষয়ে দেহেরও ক্ষয় হইবে। আর, এই যে ভোগাদির প্রয়ো-জন, ইহা জীবের বাসনাজন্য; এবং এই বাসনাই জীবের দৈহিক ও মানসিক কর্ম্মের স্রষ্টা। এই কর্ম্মসম্পাদনে যে বাসনারূপ শক্তি জীব জগতে ছাড়িয়া দেয়, সেই শক্তিই নিজের বিকাশানুকূল দেহ উৎপন্ন করিয়া তাহাতে বিকশিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; সুতরাং দেহমাত্রই কর্ম্মার্জ্জিত এবং যাহাই কর্ম্মার্জ্জিত তাহাই অনিত্য। পদার্থবিজ্ঞানই বলিয়া দিবে যে, কোন সংহ-ননই নিত্য হয় না। সুতরাং দেহ বা দেহের ভোগ কখনও নিত্য হইতে পারে না। অগত্যা ভোগের পথে জীবের জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখের অবসান হইতে পারে না। তাই "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদ-মায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন"—ব্রাহ্মণ কর্ম্মার্জ্জিত অবস্থা-সকল পরীক্ষা করিয়া এই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন যে, কৃত কার্য্য দ্বারা অকৃত অর্থাৎ নিত্য ফল লাভ হয় না।

মহান্ এই নির্ব্বেদ—মহৎ ইহার ফল। ইহাতে জীবের চিত্তকে একেবারে ঘুরাইয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। যে চিত্ত এতকাল ভাবিয়া আসিয়াছিল যে, লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কার্য্যের দ্বারা অক্ষয় স্বর্গসুখ লাভ করিয়া চির-দিনের জন্য দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবে, সেই চিত্ত একেবারে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—অসম্ভব, অসম্ভব, জগতের সম্বন্ধ থাকিতে দুঃখ কিছুতেই ঘুচিবে না, জগ-তের সহিত দুঃখ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; যদি দুঃখ হইতে অব্যাহতি চাও, তাহা হইলে এই জগতের সহিত চিরতরে সম্বন্ধ ঘুচে কিনা দেখ—নতুবা উদ্ধার নাই; জগতের বন্ধন লোহারই হউক আর সোণারই হউক, সে দুঃখ দিবেই দিবে; সুতরাং এই বন্ধন হইতে আমি একান্ত মুক্তি চাই। ইহাই মুক্তিপথের মূল নিশ্চয়। ভোগের পথ যতই লোভ-নীয়, যতই দর্শনীয়, যতই উজ্জ্বল, যতই সরল, এমন কি যতই সাধু হউক না কেন—সে মুক্তির পথ নহে। আর মুক্তির পথ প্রথমে যতই দুরূহ, যতই অন্ধকারময়, যতই অসরল হউক না কেন—সে ভোগের পথ নহে। ভোগের পথকে প্রবৃত্তিমার্গ ও মুক্তির পথকে নিবৃত্তিমার্গ বলা হয়—অবিদ্যাপথ ও বিদ্যাপথও বলা হয়। গীতায় যে 'বেদবাদ'কে যে 'ত্রৈবিদ্যা'কে নিন্দা করা হইয়াছে সে এই ভোগপথ, প্রবৃত্তিমার্গ বা অবিদ্যাপথ। বহির্বস্তুর দ্বারা চিত্তের ভোগসম্পাদনই প্রবৃত্তিপথের উদ্দেশ্য। আর নরক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত বিশাল জগতের বিশাল দুঃখময়ত্ব অনুভব করিয়া, তাহার বিশাল অভিজ্ঞতা লইয়া, সর্ব্ব-প্রকার ভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই নিবৃত্তিপথের পাথেয়। জগতের সর্ব্বত্রই প্রবৃত্তিমার্গ প্রচলিত এবং এ সম্বন্ধে সকলের ধারণা প্রায় এক বা অনুরূপ—দেবতা বা ঈশ্বরাদি মহান পুরুষের উপাসনা, পূজা, স্তুতি, নমস্কার ও সৎকার্য্য দ্বারা তুষ্টি সম্পাদন করিয়া সুখময় জীবন লাভ করা।

মনোরাজ্যে, অধ্যাত্মরাজ্যে, ধর্ম্মরাজ্যে ভারতের যদি নিজস্ব কিছু থাকে, তাহা এই নিবৃত্তিপথ বা মুক্তিপথ। যে এই পথের আলোক পাইয়াছে, তাহার চক্ষে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের সম্মুখে খদ্যোতের ন্যায় প্রবৃত্তিপথের আলোক তুচ্ছ, নিষ্প্রভ, অন্ধকারময় হইয়া যায়। এই মহা জ্যোতির অতি ক্ষীণ—ক্ষীণতম দুই-একটি রশ্মি পাইয়াই ভারতের মূঢ় জনসাধারণ এখনও এই ঘোর অধঃপতনের দিনেও পৃথিবীর অন্যান্য সর্ব্বস্থানের জনসাধারণ হইতে বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতা তাহার জগদ্ভোগের প্রতি কতকটা উপেক্ষা। ভারতে জনসাধারণের মধ্যে এখনও জগদ্ভোগের প্রতি যে উপেক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি তাহার অস্তিত্ব নাই। শত দুঃখ-কষ্ট অধঃপতনের মধ্যেও ভারতবাসী জগতের মঙ্গলবীজ এই মুক্তির পাথেয় ভোগবিমুখতাকে বক্ষে ধরিয়া রাখি-য়াছে। এ রত্নের মহিমা ভারতবাসীও বোধ হয় ক্রমে ভুলিয়া আসিতেছে এবং ভোগোন্মুখী কালের প্রবল স্রোত তাহার বক্ষ হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিনষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছে। তথাপি সত্য কখনও বিনষ্ট হইবার নহে। একদিন না একদিন মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় সে তাহার স্বাভাবিক আলোকে জগতকে উদ্ভাসিত করিবেই করিবে। জগতের সাধারণ লোক এখনও প্রায় পশুর স্তরে অবস্থিত। এই পাশবিকতার মেঘ তাহার চিত্তাকাশকে আবৃত করিয়া এই মহীয়ান্ আলোককে সেখানে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। স্বাভা-বিক বিকাশের ফলে এই মেঘ অনেক পরিমাণে অপসৃত হইবেই হইবে, এবং তখন জগৎ বুঝিবে কি অপূর্ব্ব বস্তুই ভারত তাহার জন্য প্রাণপণে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।*

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতীকার।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

দিন দিন ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে। বঙ্গদেশে কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে—যেখানে এক সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের ভেরী নিনাদিত হইত—এখন সকলে উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। মান্দ্রাজ ও বম্বের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মসমাজগুলি কেবল দীপ

---

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী। তং সং।

আলাইয়া রাখিয়াছে মাত্র। লাহোরের অবস্থাও তদ্রূপ। মফঃস্বলের ব্রাহ্মসমাজগুলির অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মফঃস্বলের ব্রাহ্মগণ ক্রমশই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রচলিত হিন্দুসমাজের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছেন। এমন কি, অনেকে এত দূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা নিজেদের ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করেন অথবা স্বেচ্ছায় আপনাদের ধর্ম্মমত গোপন করিতে চেষ্টা করেন। অনেকের মনে এরূপ ভাব আসিয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজের কাজ হইয়া গিয়াছে; এখন আর কিছু করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের অনেক মত, বিশ্বাস ও কার্য্য আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। মূর্ত্তিপূজার প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও আগ্রহ ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। তাঁহারা এখন মূর্ত্তিপূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আপনাদিগকে এক ঈশ্বরের পূজক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। সুতরাং গোঁড়া হিন্দুদিগকে বাদ দিলে ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সমস্তরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন।

অপর দিকে দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণের মধ্যে অনেকে নিরাশ হইয়া জড়বৎ নিষ্প্রাণ ও নিস্পৃহ হইয়া রহিয়াছেন। অনেকে ব্রাহ্মসমাজের কথা ভাবিতেও চাহেন না। ব্রাহ্ম প্রচারকগণের মধ্যেও অনেক শৈথিল্য উপলব্ধি করিতেছি। প্রকৃত পক্ষে অনেক প্রচারক কেবল মাত্র পুরোহিত-রূপে পরিণত হইয়াছেন। সর্ব্বত্র প্রাণের অভাব, সাধনার অভাব, কর্ম্মের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের আয়ও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিবার শক্তিও হ্রাস পাইতেছে। ব্রাহ্ম-পরিবার-সম্ভূত বালক-বালিকাগণের মধ্যে ব্রাহ্মভাব ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণের সম্মুখে যে আদর্শ বর্ত্তমান ছিল, এখন আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই অবনতির কারণ কি? আমার বিশ্বাস, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা, ব্রাহ্মগণের মধ্যে দলাদলি, বিদ্বেষ ভাব ও স্বাতন্ত্রিকতা এবং বিদেশীয় সভ্যতার প্রবল প্রতাপ ও বিদেশীয় বিলাসের ধ্বংসকর করাল গ্রাস—ইহারাই ইহার একমাত্র কারণ। এই করাল গ্রাসের মধ্যে নিপতিত হইয়া ব্রাহ্ম বালক-বালিকাগণ লক্ষ্যভ্রষ্ট, জাতিভ্রষ্ট, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট নীতিভ্রষ্ট, সাধনাভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ সংঘটিত করিবার জন্যই যেন প্রমত্ত বেগে ধাবিত হইতেছে। এ স্রোতের গতিরোধ করিবার কোনই চেষ্টা হইতেছে না, এদিকে ব্রাহ্মসমাজের নেতাদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে না।

আমি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মদিগের ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি, তাই আজ এই সকল মর্ম্মান্তিক কথা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; ব্রাহ্মগণ এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমাকে বাধ্য হইয়াই এই সকল অপ্রিয় কথা লিখিতে হইল। কারণ, আমি দেখিতেছি যে আর অধিক দিন নীরব থাকিবার সময় নাই। আমরা মহা সঙ্কটময় স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এখনও ফিরিবার আশা আছে।

ব্রাহ্মসমাজের ভাব এখন প্রধানতঃ উন্নতিশীল সাধারণ হিন্দুগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কেবল মফঃস্বলে নয়, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় স্থানেও উপাসকমণ্ডলী প্রায়শঃ এই শ্রেণীর উদার হিন্দুগণের দ্বারাই পরিপুষ্ট। সুতরাং আমাদের কার্য্য যত দূর সম্ভব হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুর সামাজিক ধর্ম্ম ও নীতির প্রকৃতি অনুসরণে হওয়াই আবশ্যক। আমি মফঃস্বলের অনেক স্থানেই দেখিয়াছি যে, তথাকার সভ্যগণ হিন্দুশাস্ত্রসম্বলিত আদিব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাসনাপ্রণালীই সমধিক প্রাণস্পর্শী বলিয়া মনে করেন, এবং ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া অনেক উদারমতাবলম্বী হিন্দুগণ স্বেচ্ছায় আমাদের উপাসনায় আগ্রহের সহিত যোগদান করেন। আমার মনে আছে, যখন আমি মান্দ্রাজে ছিলাম, তত্রত্য দক্ষিণভারতীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রতি মাসে এক দিন করিয়া আমাকে আচার্য্যের কার্য্য করিতে হইত। বলা বাহুল্য, আমি সাধারণতঃ আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালীই অবলম্বন করিতাম। কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, যে যে দিবস এইরূপ উপাসনা হইত সেই সেই দিবস উপাসনা-গৃহ প্রায়ই পূর্ণ হইয়া যাইত। অপর দিবস লোকসংখ্যা তদপেক্ষা অতি অল্পই হইত। উত্তর ভারতে আর্য্যসমাজের যে এত প্রতিপত্তি, এই হিন্দুভাবাপন্ন উপাসনাই তাহার অনেকটা কারণ। আমার মতে মফঃস্বলে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়া উপাসনাপ্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক সুফল ফলিতে পারে। হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্মমত ও প্রচলিত সামাজিক বন্ধনের প্রতি যত দূর সম্ভব আক্রমণবিরহিত হইয়া, নিজের চরিত্রের বলে, নিজের সাধনার শক্তির বলে এবং জনহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মের পথে তাহাদিগের প্রাণ জাগাইতে পারিলে ধীরে ধীরে কুসংস্কারাদি অপসারিত হইবে এবং আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব; তাঁহাদিগকে প্রতিরোধ করিলে, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অর্গল বদ্ধ করিলে, তাঁহাদিগকে দূরে রাখিলে আমাদের চলিবে না। অবশ্য ইহা ব্যক্তিগত মতামতের কথা; তবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতিও আমার এই মতের পোষকতা করিতেন।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" ব্রহ্মসাধনার দ্বারা তাঁহাকে যেমন প্রীতি করিতে হয়, লোকহিতকর কর্ম্মের দ্বারা তেমনি তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়। লোকসেবা বা সেবাধর্ম্ম এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের একটি প্রধান আদর্শ ছিল। এই সেবাধর্ম্ম সাধন ও প্রচার করিয়া বুদ্ধদেব অমর হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের এই সেবাধর্ম্মের বাণী গ্রহণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সেবাশ্রম স্থাপন দ্বারা সাধারণের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই জন্যই আজ সেই সেবাশ্রমগুলি সর্ব্বসাধারণের আদরের জিনিস হইয়া অনিতভেজে কার্য্য করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজে আজ এই সেবাধর্ম্ম ক্রমশই উপেক্ষিত হইতেছে। সেবাধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিতান্ত প্রয়োজন। যদি ব্রাহ্মগণ এই সেবাধর্ম্মের প্রতি একটু বিশেষ মনোযোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও আদরণীয় হইতে পারেন।

পাশ্চাত্য বিলাসিতার মোহ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই প্রথমে প্রবেশ করে; অতঃপর ইহার সংক্রামণ-ফলে ক্রমে সাধারণ হিন্দুসমাজও এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই আজ বিলাসিতার প্রবল বন্যা খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জাতি—সমগ্র দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। এই দুরন্ত ব্যাধি আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত ও উৎকণ্ঠিত করিতেছে। সম্প্রতি আমি একটি দরিদ্র ব্রাহ্ম পরিবারকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাদের বর্ত্তমান আয়ে দুবেলা উদরান্নের ব্যবস্থা হওয়াও অসম্ভব। ঋণজালে গৃহস্বামী আস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহের ব্যবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন হওয়া দূরে থাকুক বরং বর্দ্ধিত হইয়াছে। অনেক ঘরেই এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইবেন; একবেলা খাইতে না পাই—তবু বিলাসিতা ছাড়িয়া আপনাকে ছোট করিতে পারিব না। এই বিলাসপ্রিয়তার জন্য নৈতিক জীবনের যে কত স্খলন হইবার সম্ভাবনা, এবং হইয়াছে তাহা অনেকেরই অবিদিত নাই। আমার মতে এবিষয়ে ব্রাহ্মসাধারণের তীব্র দৃষ্টি অতি শীঘ্রই নিপাতিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এখনও যদি আমরা এই কু-প্রবৃত্তিসকলকে দূর করিতে বদ্ধপরিকর না হই, এই বহিঃসজ্জার বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা—সুন্দর হইবার ইচ্ছা সংযত না করিতে পারি,—তাহা হইলে অচিরে সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমাদের বংশধরগণ দুর্নীতির মলিন পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে। তাহাদের সাধনার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ইহাই কি আমাদের অভিপ্রেত?

মফঃস্বলের ব্রাহ্মগণ বড়ই দুর্দ্দশাপন্ন অবস্থায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বহ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার কোন উপায় নাই। তাঁহারা নির্ব্বাসিতের ন্যায় ক্রমশই নিরাশার সাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন। এমন কেহ নাই, যাঁহার নিকট তাঁহারা মনের কথা খুলিয়া বলেন। পূর্ব্বে প্রচারকগণ মধ্যে মধ্যে এই সকল স্থানে গমন করিয়া তাঁহাদিগের হতাশপ্রাণে আশার সঞ্চার করিতেন—তাঁহাদের উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন; কিন্তু এখন সেরূপ ব্যবস্থা নাই বলিলেও চলে। সুতরাং তাঁহারা ব্রাহ্মেতর সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে যে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহা শোচনীয় হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি সুবিধা পাইলেই নিকটবর্ত্তী যে যে স্থানে ব্রাহ্মপরিবার বাস করেন, তথায় যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি। ইঁহাদের অভাব আমি যতদূর জানিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, বোধ হয় অনেকের পক্ষে ততদূর বোঝা সম্ভবপর হয় নাই। এই সকল দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মপরিবারের প্রতি কি সমাজের কোনও কর্ত্তব্য নাই?

মফঃস্বলে কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মসমাজের মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে কোনকোনটিতে বৎসরের মধ্যে একবারও উপাসনা হয় না, অপরগুলিতে দুই-চারি জন মাত্র প্রতি রবিবারে উপস্থিত হইয়া নিয়মরক্ষা করেন। ইহার উপর আবার দলাদলির জন্য এই মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মের মধ্যেও মিলনের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা যদি সকলে একত্র মিলিত হইয়া কাজ করেন, তাহা হইলেও অনেক উপকার হয়। গাজিপুরে একটি মন্দির আছে, নববিধানসমাজ ইহার ট্রষ্টী। পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে উক্ত সমাজের প্রচারকগণ আসিয়া এখানে উৎসবাদি করিতেন। এখন শুনিলাম মন্দিরটি একেবারে বন্ধ থাকে। এই মন্দিরটির ভার যদি অপর সমাজের সভ্য বা প্রচারককে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভাল হয়। কিন্তু আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, ইহা সম্ভবপর হইবে না। এলাহাবাদে তিন-চারি ঘর ব্রাহ্ম আছেন। এখানকার সমাজ উঠিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পণ্ডিত ভগবৎপ্রসাদ একটি ঘর ভাড়া লইয়া ব্রাহ্মসমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সহানুভূতির অভাবে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ঘরটি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এখানে একজন অবসরপ্রাপ্ত সবজজ আছেন, তাঁহার পুত্র মিয়র কলেজের অধ্যাপক। ইনি চেষ্টা করিলে এবং যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিলে পণ্ডিত ভগবৎপ্রসাদের দ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারিত। পূর্ব্বে যে যে স্থানে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মগণ থাকিতেন তাঁহারা সমাজের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতেন; সেজন্য ঐ সকল স্থানে সমাজের কার্য্য সুন্দররূপে চলিত। যাঁহাদের ভগবান প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ধর্ম্মের

জন্য সামান্য ত্যাগস্বীকার করা নিতান্ত অসম্ভব নহে; আমার মতে তো একান্তই কর্ত্তব্য।

কাশীতে তিন-চারিটি ব্রাহ্মপরিবার বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অপর একজন শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ের জামাতা। ইঁহারা যদি একটু চেষ্টা করেন তাহা হইলে কাশীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত হইতে পারে। লক্ষ্ণৌ সহরে অনেকগুলি ব্রাহ্মপরিবার আছেন। নববিধানসমাজের একটি পাকা ব্রহ্মমন্দির তথায় আছে। নববিধানসমাজী ব্রাহ্মগণের সংখ্যা অতি অল্প। প্রতি রবিবারে দুই-চারিজন তথায় উপস্থিত হইয়া উপাসনা করেন। সাধারণসমাজের সভ্যগণের জন্য শ্রীযুক্ত এ, পি, সেন মহাশয়ের বাটীতে সাপ্তাহিক উপাসনার বন্দোবস্ত আছে। যদিও সাধারণ সমাজের সভ্যগণের সংখ্যা অধিক, তথাপি অতি অল্প লোকই এই উপাসনায় যোগ-দান করিয়া থাকেন। যদি লক্ষ্ণৌবাসী সমস্ত ব্রাহ্মপরিবার সমাজমন্দিরে যাইয়া একত্র উপাসনা করেন তাহা হইলে উক্ত সমাজের উন্নতি হইতে পারে।

কলিকাতার ব্রাহ্মগণ যে কারণে আদিসমাজের উপাসনায় এতদিন যোগ দান করিতে আপত্তি করি-তেন, বর্ত্তমান বৎসরে সে কারণ তিরোহিত হই-য়াছে। এবৎসর মাঘোৎসবের সময় আদিব্রাহ্মসমাজ উদার নীতি অবলম্বন করিয়া সকল শ্রেণীর ব্রাহ্ম-গণের মিলনের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। এখানে প্রতি বুধবার উপাসনা হইয়া থাকে। উক্ত দিবস অপর কোন সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা হয় না। সুতরাং আদি ব্রাহ্মসমাজের বুধবাসরিক উপাসনায় অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের যোগদান করা আবশ্যক জ্ঞান করি। কলিকাতা সহরে এইরূপ সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইলে মফঃস্বলের ব্রাহ্মসমাজগুলি তদনুকরণে এই উদারনীতি অবলম্বন করিতে পারে।

কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় সহরে মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ নিমিত্ত এলবার্ট হল, রাম-মোহন লাইব্রেরী এবং ভবানীপুর সম্মিলন-সমাজ, সাধারণ-সমাজ নববিধানসমাজ ও আদিসমাজের উপাসনামন্দিরে পর্য্যায়ক্রমে স্থাননির্দ্দেশ করিলে এবং ইহাতে সকল সমাজের সভ্যগণ যোগদান করিলে, অতি শীঘ্রই আমরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি। আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে আমার জনৈক বন্ধু এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ভগবান তাঁহার চেষ্টা সফল করুন।

আমি আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। আমি আশা করি যে, আমার উপরি-উক্ত প্রস্তাবগুলি ব্রাহ্ম-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি. এইচ-ডি কৃত অনুবাদ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনিরুদ্ধ এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—"প্রত্যক্ষ-পূর্ব্বকত্বাৎ ব্যাপ্তেঃ, তদভাবাৎ কুতঃ সম্বন্ধগ্রহঃ? ন চ অসাধারণস্য সম্বন্ধগ্রহঃ"। অর্থাৎ "যেহেতু ব্যাপ্তির পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তাহারই অবর্ত্তমানে ব্যাপ্তির জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? আবার, যে বস্তু অন্য বস্তুর সহিত একেবারে অসম্বদ্ধ অথবা সম্বন্ধাতীত, তাহার বিষয়েও এইরূপ কোনও ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না"। মহাদেব বলেন—"সম্বন্ধাভাবাৎ", অর্থাৎ "ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ না থাকায় ঈশ্বরেরও কোনও অনুমান হইতে পারে না"। বিজ্ঞান বলেন—"সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ, অভাবোঽসিদ্ধিঃ। তথা চ মহদাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাদিত্যাদ্যনুমানেষু প্রযোজকত্বেন ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ্যা নেশ্বরেঽনুমানমিত্যর্থঃ", অর্থাৎ সম্বন্ধ=ব্যাপ্তি=অবি-চ্ছেদ্য যোগ, অভাব=অসিদ্ধি। অতএব—

১। যাহা কিছু কার্য্য, তাহার কারণ ঈশ্বর;

২। মহাদাদি সমুদায়ই কার্য্য (কারণের দ্বারা অনুস্যূত);

৩। সুতরাং, ঈশ্বরই নিশ্চয় তাহাদের কারণ।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ কোনও অনুমান খাটিতে পারে না, কারণ ঈশ্বরের সহিত মহদাদি কোনও কার্য্যেরই ব্যাপ্তি বা অবিচ্ছেদ্য যোগ দৃষ্ট না। ইহাই তাৎপর্য্য।

সুতরাং উপরের ব্যাখ্যাগুলির সার মর্ম্ম এই যে, ঈশ্বরের সহিত জাগতিক কোন কার্য্যেরই ব্যাপ্তি বা অবি-চ্ছেদ্য যোগ না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে কোনও অনুমান হইতে পারে না। কারণ, একটী বস্তু হইতে অপর একটী বস্তু তখনই অনুমিত হইতে পারে, যখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ থাকে; কিন্তু এরূপ সম্বন্ধের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে না পারিলে এক হইতে অপরের অনুমান সম্ভবপর নহে। জগতে পরিদৃশ্যমান মহদাদি কার্য্য হইতে ঈশ্বরের অনুমানও অবিকল এইরূপ। কারণ, তিনি অসঙ্গ—বিশ্বের কোনও-কিছুর সহিতই তিনি লিপ্ত নহেন। যদিও একথা স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর অসঙ্গ (কিন্তু বস্তুতঃ, আমরা পরে প্রমাণ করিব যে ঈশ্বরের সহিত জগতের একটী গৌণ সম্বন্ধ আছে), তাহা হইলেও আমরা বড়

জোর এই কথাই প্রমাণ করিতে পারি যে, তিনি অকর্ত্তা বা তিনি কারণরূপে বর্ত্তমান নহেন; কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব নাই একথা প্রমাণ হয় না। অনুমানটীর সার মর্ম্ম এই যে, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বা কারণত্ব ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের দ্বারা যে সমস্ত অনুমতিজনক বিষয় পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতে পারে না; সাংখ্যও সকল অনুমানের মূলে এই প্রত্যক্ষকে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই বুঝা যায় না; তাহার অতি সরল কারণ এই যে, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বা কারণত্ব অসিদ্ধ বা অপ্রমাণিত হইলেও তাহা হইতে তাঁহার অস্তিত্ব কোনও রূপে অসিদ্ধ হইতে পারে না। তিনি কর্ত্তা না হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অস্তিত্বও যে নাই, একথা অবশ্যই বুঝায় না। তিনি কর্ত্তা না হইয়াও থাকিতে পারেন; তিনি অন্যরূপে, অর্থাৎ সাক্ষীরূপেও ত থাকিতে পারেন। একটী উদাহরণের দ্বারা বিষয়টী আরও স্পষ্ট হইতে পারে। 'ক'কে যদি আমরা 'খ'য়ের কারণ বলিয়া নাও মানি, তাহা হইলেও যতক্ষণ 'ক'এর কারণ হওয়া আর 'ক'য়ের অস্তিত্ব থাকা এককথা না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'ক' যে নাই একথা আমরা বলিতে পারি না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকারেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিবার জন্য এই সূত্রটীর যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে কেবল ভ্রান্ত তাহা নহে, ইহা একেবারেই বিকৃত। সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্রে এই বিষয়টী আরও দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—

(১৯) "শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য", অর্থাৎ "শ্রুতিও জগতকে প্রধান বা প্রকৃতিরই কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন"। সকল ভাষ্যকারই নিজের নিজের বিশিষ্ট ধরণে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনিরুদ্ধ বলেন—"প্রধানাৎ জগৎ উৎপদ্যতে ইতি শ্রুতিঃ অস্তি। তস্মাৎ ঈশ্বর-সাধকপ্রমাণানি আভাসানি।" অর্থাৎ "এইরূপ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে যে প্রধান হইতেই জগৎ উৎপন্ন; সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণগুলি বাস্তব নহে (অস্ফুটভাবে অভিব্যক্ত—আভাস মাত্র)"। জগৎ প্রকৃতির কার্য্য, ইহা হইতে ঈশ্বর নাই এ কথার অনুমান কিরূপে যে হইতে পারে, তাহা বুঝা কঠিন। প্রকৃতিই জগতের প্রকৃত কারণ—এই উক্তি দ্বারা যদি কোনও কিছু প্রমাণ হয়, তবে সে প্রমাণ এই যে, ঈশ্বর ইহার প্রকৃত কারণ নহেন; কিন্তু ইহা দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বই যে নাই একথা কিছুতেই প্রমাণ হইতে পারে না। ইহা এরূপ কোনও সিদ্ধান্তের আভাসও দেয় না। তাহা হইলে কোথা হইতে অনিরুদ্ধ এরূপ একটী অসঙ্গত (absurd) অনুমান করিলেন? তিনি নিশ্চয়ই এই সমগ্র যুক্তিটীর মর্ম্মার্থ ভুল বুঝিয়াছেন। অবশ্য ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—"প্রপঞ্চে প্রধানকার্য্যত্বস্যৈব শ্রুতিরস্তি ন চেতনকারণত্বে। যথা অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ"। অর্থাৎ "প্রপঞ্চসৃষ্টি-বিষয়ে এরূপ শ্রুতি বা বেদবাক্য আছে যে ইহা প্রকৃতির কার্য্য, কোনও চেতনাবিশিষ্ট পুরুষ ইহার কারণ নহে;—যথা লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টা একটী উৎপত্তিবিরহিতা (অজ) প্রকৃতি নিজেরই স্বরূপে বহু সন্ততি সৃষ্টি করিয়াছেন"। এখানে তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে শ্রুতি কেবল ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিতেছেন, তাঁহার অস্তিত্ব নহে। বিষয়টী তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতির অপর একটী বচন হইতেও প্রমাণিত হয়। বচনটী এই—"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ", অর্থাৎ "ঈশ্বর হইতেছেন সাক্ষী, চৈতন্যময়, একাকী ও নির্গুণ"। ইহা দ্বারা এই বুঝায় যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এবং কেবল এই সকল গুণই তাঁহার আছে, কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি অন্য গুণ তাঁহাতে নাই। তিনি আরও একটী কৌতুকাবহ জিনিস স্বীকার করিয়াছেন—"অয়ং চেশ্বরপ্রতিষেধঃ ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্যার্থমীশ্বরজ্ঞানং বিনাপি মোক্ষপ্রতিপাদনার্থং চ, প্রৌঢ়িবাদমাত্রম্"। অর্থাৎ "ঈশ্বরাস্তিত্বের এই অস্বীকারোক্তি কেবলমাত্র প্রৌঢ়িবাদ বা দুঃসাহসিকের উক্তি। ইহা কেবল ঈশ্বরাবস্থাপ্রাপ্তিতে বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্য এবং ঈশ্বরজ্ঞান ব্যতীতও মুক্তিলাভ হইতে পারে ইহাও প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলা হইয়াছে"। এই স্বীকারোক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বিজ্ঞানের মতে এই সূত্রে বাস্তবিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইতেছে না, কিন্তু তথাপি উপরি-উক্তরূপ কোনও অভিসন্ধি লইয়া ইহা যেন অস্বীকার করিতে চাহিতেছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এইরূপে অস্বীকার করিলে ইহার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি যে অসম্বদ্ধ ও অযৌক্তিক কথা আসিয়া পড়ে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই তিনি এইরূপ অদ্ভুত ও কদর্য্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, এ কথা প্রত্যক্ষভাবে শ্রুতিবাক্যের বিরোধী হইয়া পড়ে; সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব, যেহেতু তৃতীয় প্রমাণ—আপ্তবচন অর্থাৎ বেদবাক্য দ্বারা ইহা প্রমাণীকৃত হয়। অতএব বিজ্ঞান ও অনিরুদ্ধের ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে অক্ষম।

সাধারণ সিদ্ধান্ত।—এক্ষণে এই দীর্ঘ যুক্তিজাল হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, পূর্ব্বোক্ত দুইটী শ্রেণীর (ক ও খএর) সূত্রগুলিতেই যে যুক্তির অবতারণা হইয়াছে, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা ত নহেই, তাঁহার অস্তিত্বের যে

কোন প্রমাণ নাই, তাহাও দেখান নহে। প্রথম শ্রেণীর সূত্রগুলিতে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য কেবল ইহাই দেখান যে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখাইতে পারে না, এবং আমরাও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারি না; আর পূর্ব্বোক্ত ৫ম ও ৬ষ্ঠ সূত্রে স্পষ্ট বলা হইতেছে যে ঈশ্বর আছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সূত্রগুলির উদ্দেশ্য একেবারে ভিন্নরূপ। ইহাদের উদ্দেশ্য ইহাই দেখান যে, প্রকৃতিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগতের প্রকৃত কারণ—ঈশ্বর নহেন; ঈশ্বর কেবল পরোক্ষভাবে প্রকৃতির সহিত যুক্ত; এবং শ্রুতিও যখন বলিতেছেন যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকৃতিই জগতের কারণ, তখন ঈশ্বর যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগতের কারণ, তাহার কোনও শাস্ত্রীয় বা আগম প্রমাণ নাই। অবশ্য ঈশ্বরকে গৌণ কারণ বলা যাইতে পারে, কারণ প্রকৃতি ঈশ্বরসান্নিধ্য হেতুই সৃষ্টিকার্য্যের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে; কিন্তু স্বরূপতঃ ঈশ্বর অসঙ্গ ও নিত্যমুক্ত। পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলিতে সাংখ্য এই কথাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এবং আমাদের বোধাতীত যে অনিরুদ্ধ, বিজ্ঞান ও মহাদেবের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারেরা পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি হইতে এরূপ একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, যাহা কেবল আশ্চর্য্যকর যে তাহা নহে, কিন্তু সাংখ্য সম্বন্ধে আরও যে অধিক বিশ্বসনীয় ব্যাখ্যা আছে তাহার সহিত অসামঞ্জস্যকর। অধিকন্তু, এই ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের নিজের নিম্নলিখিত বাক্যটীর সহিতও অসম্বদ্ধ। সে বাক্যটী এই—"কপিলমূর্ত্তিধারী ভগবান্ এই বিবেকশাস্ত্র দ্বারা আত্মানাত্মবিবেক সম্বন্ধে এই ষড়ধ্যায় গ্রন্থ উপদেশ করিয়াছিলেন, যাহা শ্রুতির অবিরোধী"। (সাংখ্যদর্শনের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য)। আবার "জীবের অশেষ দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে এবং বেদোপদিষ্ট সত্যের মননের দ্বারা যাহাতে উহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় এই উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ শাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্ত নারায়ণ কপিলমূর্ত্তি ধরিয়া সাংখ্যের প্রণেতৃরূপে ধরায় অবতীর্ণ হন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।" (ঐ ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ভূমিকা হইতে আরও অনেক ঐরূপ বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে আমাদের দুইটী জিনিষের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত:—প্রথমতঃ, স্বয়ং ভগবানই যদি কপিলমূর্ত্তি ধরিয়া সাংখ্যদর্শন উপদেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে বেদবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে পারেন? কারণ বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বহুস্থানে স্বীকৃত হইয়াছে। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তত্ত্বসমাস, পঞ্চশিখসূত্রম্ ও সাংখ্যকারিকাতে এরূপ কিছুই নাই যাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইতেছে, অথবা ঈশ্বরাস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই এরূপ কথা বলা হইয়াছে; অধিকন্তু আমরা অচিরাৎ দেখিতে পাইব যে কেবলমাত্র ঐগুলিতে নয়, এমন কি সাংখ্য-প্রবচন সূত্রেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

সন্ধ্যায়।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ)

আসে সন্ধ্যা পূর্ব্বগগন পরে—
ঢেউ খেলে যায় রক্ত আভা
প্রতীচ্য অম্বরে;
নদীর জলে যাচ্ছে ভাসি',
শুক্রতারার মধুর হাসি,
অনন্ত গান উঠ্‌ছে ফুটে
স্রোতের কলস্বরে—
সন্ধ্যা নামে বিরাট ভুবন পরে।

সুদূর নদীর পারে,
নারীর কণ্ঠে শঙ্খ বাজে—
স্বচ্ছ অন্ধকারে।
গগন-পথে সারি সারি
বলাকা যায় আপন বাড়ী,
দীপ্ত করি শুভ্রবর্ণে
সুনীল পারাবারে।
সন্ধ্যা আসে ভুবন মাঝে
উজল তারা-হারে।

আমি বসে একা নদীর কূলে—
শেষ খেয়া যে গেছে চলে'
সবুজ পালটী তুলে'।
নাইক আমার কোন সাথী,
ঘনিয়ে আসে গভীর রাতি,
কেমন করে' যাব পারে
তাই গিয়েছি ভুলে'।
সন্ধ্যা হাসে প্রাচ্য গিরির মূলে।

তুমি আমায় করে দেবে পার?
কেউ নাই যার বিশ্বমাঝে
তুমিই আছ তার।
তোমার দয়া আনবে তরী
পারে নেবে হাতটী ধরি'
মুছিয়ে দিয়ে সজল-আঁখি
নীরব হাহাকার—
সন্ধ্যা আসে সুদূর নদীর ধার।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

বাহার—একতালা।

বিশ্বেশ্বর-মন্দিরে এই কে রহিবে নিরানন্দ?
উথলে যে হেথা চির-উৎসব বহে হেথা চিরানন্দ।
ফুল ফোটে হেথা গাহে পাখী
কুঞ্জে কুঞ্জে মুঞ্জরে শাখী
গুঞ্জরে অলি—ধায় নদী
বহে বায় ফুলগন্ধ।
দুঃখেরে মোরা ডাকি, মোহঘোরে সদা থাকি
জীবনে মরণে পরম দেবতা, তাঁরে সদা পিছে রাখি।
তাঁরে রেখে হৃদে সাধিলে কাজ
কোথায় দুঃখ—কোথায় লাজ,
চির-আনন্দ করে বিরাজ
টুটে যায় মোহ-বন্ধ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

```
 ২´          ৩             ০              ১              ২´
II গা -া ধণা। -পা পা মা। মা -পধা পা। মা জ্ঞা জ্ঞা I মা গা গা।
   বি ০ শ্বে    ০ শ্ব র    ম ০ন্ দি     রে এ ই       কে র হি

 ৩          ০              ১        ॥  ২´            ৩
। গা ধা গা। পা -র্সনা র্সা। -গা -ধা -া I না না না। নর্সা র্সা র্সা।
  বে নি রা   ন ০ন্ দ        ০ ০ ০       উ থ লে     যে০ হে থা

 ০           ১              ২´            ৩            ০
। না র্রা র্রা। -র্জ্ঞা র্সা র্সা I না র্রা র্সা। গা ধা গা। পা -র্সনা র্সা।
  চি র উ      ৎ স ব          ব হে, হে    থা চি রা   ন ০ন্ দ

 ১
। -গা -ধা -া II
  ০ ০ ০

 ২´           ৩           ০               ১             ২´
II { মা -গা ধা। ধা ধা না। না না নর্সা। র্সা -া -া I নর্সা -র্রা র্রা।
     ফু ল্ ফো    টে হে থা  গা হে পা০    খী ০ ০        কু০ ন্ জে

 ৩              ০              ১   [গা]    ২´              ০
। র্রাঃ -র্জ্ঞঃ র্সা। নর্সা -র্রা র্সা। গা ধা ধা } I র্সা -র্মা র্মা। র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা।
  কু ন্ জে         মু০ ন্ জ        রে শা খী       গু ন্ জ        রে অ লি

 ০               ১            ২´           ৩           ০
। র্রর্জ্ঞা -র্মা র্রা। র্সা -া -া I গা গা গা। -া ধা গা। পা -র্সনা র্সা।
  ধা০ য় ন           দী ০ ০        ব হে বা   য় ফু ল   গ ০ন্ ধ

 ১
। -গা -ধা -া II
  ০ ০ ০
```

২´ ৩ • ১ ২´
II সা -মা মা। মা মা মা। মগা -পা মা। -া -া -া I মা পা মপা।
দুঃ • খে রে মো রা ডা• • কি • • • মো হ ঘো

৩ • ১ ২´ ৩´
।মা গা গা। মা -ধপা ধা। -া -া -া I ধা ণা ধণা। পা পা পা।
রে স দা থা •• কি • • • জী ব নে ম র ণে

• ১ ২´ ৩ •
।মজ্ঞা মজ্ঞা মা। মা ণা পা I মা জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা মা মা। রা -া সা।
প• র• ম দে ব তা তাঁ রে স দা পি ছে রা • খি

১ ২´ ৩ • ১
।-া -া -া I {মা ণা ধা। ধা ধা না। না র্সা না। র্সা -া -া I
• • • তাঁ রে রে খে হু দে সা ধি লে কা • জ

২´ ৩ • ১ ২´
I র্রা র্রা -া। র্রা -র্সা র্সা। র্সা নর্সা -র্রর্সা। ণা ধা -া } I র্সা র্মা র্মা।
কো থা য় দুঃ • খ কো থা• •য় লা জ • চি র আ

৩ • ১ ২´ ৩
।র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা। র্মা র্মা র্রা। র্সা -া -া I ণা ণা ণা। -া ধা ণা।
ন ন্ দ ক রে বি রা • জ টু টে যা য় মো হ

• ১
।পা -র্সনা র্সা। -ণা -ধা -া II II
ব •ন্ ধ • • •

—•—

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'স্বপ্নময়ী'। পুরুবিক্রম নাটকের দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে যে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকের ধারা প্রবর্ত্তিত করেন, সেই ধারার পুষ্টিসাধনার্থ 'সরোজিনী' ও 'অশ্রুমতী'র পর 'স্বপ্নময়ী' নামক আর একখানি নাটক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। আমরা প্রথম তিনখানি নাটকের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকের আর পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই নাটকখানি তাঁহার পূর্ব্ব যশঃ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শোভা সিংহের বিদ্রোহ অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, শোভাসিংহ বর্দ্ধমান রাজদুহিতার অবমাননা করিবার চেষ্টা করিলে রাজকুমারী ছুরিকাঘাতে তাহাকে হত্যা করেন। স্বদেশপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবি-জনোচিত স্বাধীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক দেশবাসীর দৃষ্টির সমক্ষে বিদ্রোহী শোভাসিংহকে উন্নতচরিত্র স্বদেশপ্রেমিকরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি মুসলমানগণের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে দেশকে মুক্ত করিতে অভিলাষী। অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই গ্রন্থেও অনেকগুলি সুন্দর প্রেমগীতি ও জাতীয় সঙ্গীত আছে। রবীন্দ্রনাথের রচিত কয়েকটি গানও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল গান বাঙ্গালা সঙ্গীতসংগ্রহে চিরদিন অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

শোভাসিংহের নিকট দেশপ্রেমে দীক্ষিত বর্দ্ধমান রাজদুহিতা স্বপ্নময়ী যথার্থ মাতৃমূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছেন :—

"কে আমারে বক্ষে ক'রে করেছে পোষণ ?
কে মোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে ?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা ?
ধন-ধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার ?
কে মোর পিতার পিতা, মাতার জননী ?
কোথা হতে পিতা মোর পেয়েছেন জ্ঞান ?
কোথা হতে মাতা মোর পেয়েছেন স্নেহ ?
কে তিনি আমার মাতা ?—তিনি জন্মভূমি।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন এই সকল নাটক লিখিতেছিলেন, তখন 'ভারতসঙ্গীত' ও 'ভারতভিক্ষা'র কবি হেমচন্দ্রের যুগ। সুতরাং কোনও কোনও স্থানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায় তাঁহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এক স্থানে শোভাসিংহ অনুচরগণকে দেশজননীর কিরীট-শোভার জন্য স্বাধীনতারত্ন অর্জ্জন করিয়া আনিতে উদ্দীপ্ত করিতেছেন—

"দূর আকাশের তলে ওই যে রতন জ্বলে
আনিতে কে যাবি তোরা
এই বেলা আয় রে—
মায়ের আঁধার ভালে পরাবি ও রত্নখানি
কে আসিবি আয় তোরা
মিছা দিন যায় রে।
সমুখে দুর্গম পথ প্রত্যেক কণ্টক তার
মাড়াইতে হবে বটে
রক্তময় চরণে,
কিন্তু রে কিসের ভয়, আসুক সহস্র বাধা
মাতৃমুখ উজ্জ্বলিবি
কি ভয় রে মরণে।"

আমরা বাহুল্য ভয়ে সুমধুর সঙ্গীতগুলির একটিও উদ্ধৃত করিলাম না।

এই সুরুচিসঙ্গত উচ্চভাবপূর্ণ নাটকাবলী প্রণয়ন করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাৎকালিক নাট্যকারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু 'স্বপ্নময়ী'র পরে তাঁহার প্রতিভাশালিনী লেখনী আর এইরূপ নাটক রচনায় নিয়োজিত হয় নাই। এই সময়ে কতকগুলি পৌরাণিক নাটক লইয়া কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা সন্দর্শন করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক-রচনা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য দিকে তাঁহার অনন্য-সাধারণ প্রতিভা বিনিযুক্ত করিলেন। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, তিনি একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাঁহার নাটকাবলী সমগ্র দেশবাসী কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত ও সমাদৃত, তিনি কেন নাটকরচনা সহসা পরিত্যাগ করিলেন। উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন—'নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই'। অমৃতলাল বলেন, তাঁহার দীর্ঘ জীবনে কাহারও নিকটে 'প্রয়োজন নাই' এইরূপ উত্তর শুনেন নাই। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কখনও যশোলাভকেই সাহিত্য-সাধনার মুখ্য ফল বলিয়া বিবেচনা করেন নাই, সাহিত্য-সেবা তাঁহার নিকট অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। সুতরাং অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে অধিকৃত গৌরবময় সিংহাসন প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকারকে স্বেচ্ছায় প্রদান করা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আজীবন নীরবে সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন; তিনি ঢক্কা নিনাদে কখনও আত্মঘোষণা করেন নাই বলিয়া আজিকার যুগে হয়ত তিনি তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মানও পান নাই; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সাহিত্যসাধনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কি অপূর্ব্ব প্রতিভা তিনি সর্ব্বদা লোকলোচনের অন্তরালে গোপন রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

সারস্বত সমাজ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তদীয় আবাসভবনে একটি সাহিত্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করেন। রবীন্দ্রনাথ এতৎ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটী পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও নানারূপে সর্ব্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান সাহিত্যপরিষদ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সঙ্কল্পিত সভার প্রায় কোনও অনৈক্য ছিল না।"

বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন" শীর্ষক এক সন্দর্ভে এইরূপ সাহিত্য-সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বিশদভাবে বিবৃত করেন। সন্দর্ভটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধমঞ্জরী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধমধ্যে সঙ্কল্পিত সভার অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলী হইতেও অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারেন।

শীঘ্রই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবাসভবনে 'সারস্বত সমাজ' স্থাপিত হইল। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবকগণ সকলেই এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহা উৎসাহের সহিত এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবসায়ের সহিত ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সভায় যোগদান করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"যখন বিদ্যাসাগরমহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন—আমি পরামর্শ দিতেছি আমাদের মত লোককে পরিত্যাগ কর—হোমরা-চোমরাদের লইয়া কোন কাজ হইবে না, কাহারো সঙ্গে কাহারো মতে মিলিবে না।—এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না। বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।"

এই সভায় কিরূপ কার্য্য হইত, তাহা রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত * ১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠে প্রতীত হয়।

সারস্বত সমাজের প্রস্তাবসমূহ সুধীগণ কিরূপ সযত্ন সতর্কতার সহিত আলোচনা করিতেন তাহার পরিচয় রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সাহিত্য-রথিগণের পত্রাবলী পাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১৮৪১ শকের কার্ত্তিক সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী'তে এইরূপ দুইখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় দূরদর্শী বিদ্যাসাগর মহাশয় যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন' শীর্ষক সন্দর্ভের শেষভাগে লিখিয়াছিলেন—

"সভার স্থায়িত্বের প্রতি এখন কেবল একটি মাত্র সংশয় আছে। আমাদের সাহিত্য-সংসারে অনেকগুলি দলপতি। প্রায় সকল দলপতিই একস্থানে সমবেত হইয়াছেন, এখানে যদি তাঁহারা ক্ষুদ্র দলাদলির ভাব ত্যাগ করিয়া, নিজের ক্ষুদ্র অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, উৎসাহের সহিত একহৃদয়ে সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত হন তবেই সারস্বত সম্মিলনের পক্ষে মঙ্গল। নচেৎ যে আয়োজন করা হইতেছে,—সে কেবল বাঙ্গালীর আর একটি কলঙ্ক-ধ্বজা স্থাপনের নিমিত্ত।"

দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে যে, অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সদুদ্দেশ্য বিফল করিয়া তাঁহার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

"বিদ্বজ্জন-সমাগম।" এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তদীয় ভবনে একটি বার্ষিক সাহিত্যসম্মেলনেরও অনুষ্ঠান করেন। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই সম্মেলনের নামকরণ করিয়াছিলেন 'বিদ্বজ্জন-সমাগম'। এই সম্মেলনে প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণকে নিমন্ত্রিত করা হইত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে নানাপ্রকার গীতবাদ্যের এবং অভিনয়ের আয়োজন করিতেন। এই সকল অভিনয়ে পরিবারস্থ বালকবালিকাগণই যোগদান করিতেন।

"কালমৃগয়া" ও "বাল্মীকি-প্রতিভা" এই উপলক্ষেই প্রথম রচিত ও অভিনীত হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে ডিসেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে 'কালমৃগয়া'র অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের, রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনির এবং পরিবারস্থ বালিকাগণ বনদেবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'ভারতবন্ধু' নামক তৎকালীন এক সংবাদপত্র হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

"বিদ্বজ্জন-সমাগম। গত শনিবার রাত্রে ৬দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে বিদ্বজ্জন সমাগম হইয়াছিল। এই সমাগম উপলক্ষে "কালমৃগয়া" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাট্যগীতি রচিত হইয়া ঐ রাত্রে অভিনীত হয়। অভিনয় অনেকাংশে সুন্দর হইয়াছিল। গৃহদেবীরা বনদেবী সাজিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বিদূষকের অভিনয়ের শেষাংশ ভাল হয় নাই। মুনিকুমার পিতার নিমিত্ত জল আনিতে গেলে লীলা তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে অন্ধমুনির নিকট যেরূপে গান গাহিয়াছিল, তাহা শুনিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়।"

'বাল্মীকি-প্রতিভা' আরও সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই অভিনয়ে কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই, তিনি কনসার্টের ভার লইয়াছিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অধিকাংশ গীতই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রদত্ত সুরে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির, হেমেন্দ্রনাথের কন্যা (পরে স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী) প্রতিভা দেবী সরস্বতীর, এবং সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা (একণে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ব্যারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী) ইন্দিরা দেবী লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অভিনয় অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছিল।

প্রতিভা দেবীর বিবাহের পর তাঁহাকে অভিনয়ে যোগদান করিতে দিতে তাঁহার মাতা অসম্মত হন। সেবার ভয়ানক ঝটিকার (cyclone) জন্য অভিনয়ের

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৮৪৪ শক, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আয়োজনও পণ্ড হইয়া যায়। "বিদ্বজ্জন সমাগম"ও সেই অবধি বন্ধ হইয়া যায়।

'হঠাৎ নবাব'—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আগমন করিলে যোড়াসাঁকোর বাটীতে নানাপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদ-উৎসবের অনুষ্ঠান হইত এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সকল উৎসবের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। 'অলীক বাবু'র ন্যায় 'হঠাৎ নবাব'ও গার্হস্থ্য অভিনয়ের উদ্দেশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। এই প্রহসনখানি ১৮০৬ শকের বৈশাখে অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহা মৌলিক কল্পনা-প্রসূত নহে, জগৎপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্রহসনকার মলিয়র প্রণীত "লে বুর্জোয়া জান্তিয়ম্" নামক প্রহসন হইতে উহা অনূদিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী সাহিত্যকুঞ্জের বহু অপূর্ব্ব প্রসূন বঙ্গবাণীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার দিগন্তবিসর্পী সৌরভে বাঙ্গালার সাহিত্য-কুঞ্জ চিরদিন সুরভিত থাকিবে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই সকল অনুবাদ-গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় দিবার স্থান নাই, যদিও সাহিত্যের এই চির-অবজ্ঞাতক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার যে অনন্য-সাধারণ অধ্যবসায় ও শক্তি বিনিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাকে একটি বিশিষ্ট এবং উচ্চস্থান প্রদান করিবে।

এই প্রহসনের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই। কোনও দোকানী হঠাৎ কিছু ধনলাভ করিয়া বড়লোকের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করে। তাহার দুহিতা এক দরিদ্র যুবাকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু দরিদ্র বলিয়া সে কিছুতেই সেই যুবার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইল না। তখন ঐ যুবা কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে তুর্কের নবাব সাজিয়া ছদ্মবেশে তাহাকে প্রতারিত করিল। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থখানিতে প্রচুর হাস্য রস আছে এবং ইহা পরবর্ত্তী বহু প্রহসনের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মহারাজের সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমাদের এ বয়সে সুখ বা দুঃখ সমস্তই যেন লুকাইয়া থাকিতে চায়—প্রকাশ করিয়া জানাইতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই মহারাজের আকস্মিক মৃত্যুতে আমার হৃদয়ে যে কতটা আঘাত লাগিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে যাইব না। তবে ব্যথা লাগিবার যে বেশ একটু কারণ আছে, তাহাই নিয়ে অল্পস্বল্প প্রকাশ করিব।

আমার মনে পড়ে, মহারাজের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম আমার পরিচয় হয় আমার ভগিনীপতি ৺আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে। আমার দিদি ৺প্রতিভাদেবীর সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তিনি আমাদের পরিবারের সহিত পরিচিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে আমরা দেখিতাম যে, অধিকাংশ রাজা-মহারাজাই আড়ম্বরপ্রিয় এবং ঐশ্বর্য্যদৃপ্ত; সুতরাং আমরা ভাবিয়াছিলাম, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথও বুঝি সেই ধরণের হইবেন। কিন্তু দেখিলাম যে, আমাদের সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কি অমায়িক! তাঁহার অমায়িকতায় আমরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

তাঁহার সহিত যতই আলাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তাঁহার অন্যান্য গুণেরও পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইতে লাগিলাম।

প্রথম তাঁহার যে গুণটি আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার অন্তর্নিহিত বিনয়ের ভাব। বিনয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি আপনাকে গোপনে রাখিতে ভালবাসিতেন। সেই জন্যই, যখন আমার ভগিনীপতি স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে তাৎকালীন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ করেন, তিনি স্বীকার করেন নাই; অবশেষে অনেক পীড়াপীড়িতে তবে স্বীকার করিলেন। সেখানে যাইয়া তিনি মস্ত জমীদার হওয়া সত্ত্বেও, প্রজাদের ও দেশের মঙ্গলসাধনে কিরূপ অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়।

তাঁহার হৃদয় যে কতদূর উদার ছিল, তাহার প্রথম পরিচয় পাইলাম—যখন তাঁহাকে আমার এক ভগিনীর বিবাহে নিমন্ত্রণ করিতে যাই। তিনি হিন্দুসমাজের এক সমাজপতি—আর আমরা মহর্ষির পরিবারভুক্ত—একে ব্রাহ্ম, তাহাতে আবার পিরালী ব্রাহ্মণ। তাহা সত্ত্বেও তিনি যে কেবল অকুণ্ঠিত চিত্তে আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন তাহা নহে, আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এরূপ ভাবে বিবাহসভা জমাইয়া তুলিলেন যে, সকলেই তাঁহার লোকরঞ্জনের ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। শুধু তাহাই নহে—তিনি প্রাচীন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নেতা হওয়া সত্ত্বেও সানন্দে আমাদের সহিত আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। হিন্দুসমাজের সেই কঠোর রক্ষণশীলতার দিনে এই কার্য্য অল্প মানসিক বলের পরিচায়ক নহে। সমাজের সহস্র ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়াও, যাহা তিনি ন্যায় বলিয়া বুঝিতেন, তাহার অনুষ্ঠানে বিচলিত হইতেন না। এই সম্বন্ধে আমি সেইকালে প্রকাশিত

'আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা' নামক আমার গ্রন্থে লিখিয়াছিলাম—"প্রাচীন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নেতা তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যথার্থ লজ্জানিবারক পরিচ্ছদ এবং 'সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ' এই শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উপানহের ব্যবহার প্রচলিত করাতে স্বদেশে তাঁহাকে লোকে পরোক্ষে খৃষ্টান বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না।" কিন্তু এই নিন্দাতেও তিনি ভীত বা ক্ষুব্ধ হয়েন নাই। যাহা তিনি উচিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার অসাধারণ সঙ্গীতবিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু না বলিলেও চলে। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনও মজলিসই যেন সম্পূর্ণ বোধ হইত না। তাঁহার পাখোয়াজ বিনা কোনও গীতবাদ্যের সভাই যেন জমিত না—মৃদঙ্গ তাঁহার হাতে যেন কথা কহিত। দিদি তাঁহার বাড়ীতে 'আনন্দ-সভা' নামক যে এক বার্ষিক সভা স্থাপন করেন, তাহার অধিবেশন প্রতি বর্ষের প্রথম দিনে হইত। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সেই সভার এক বিশেষ উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

তিনি যে কেবল গীতবাদ্য ও মজলিস লইয়াই থাকিতেন, তাহা নহে। যতই তাঁহার সহিত আলাপ ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল, ততই দেখিতে লাগিলাম যে, জ্ঞানানুরাগও তাঁহার নিতান্ত অল্প নহে। এমন কি, বিজ্ঞানের বেদীর তলে তিনি আপনার একটী চক্ষুকে বলিদান করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সহিত সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, সাহিত্যের মঙ্গলভাবকে তিনি বিশেষরূপেই হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; অন্যান্য বিদ্যার প্রতিও তাঁহার অসীম অনুরাগ ছিল। কিন্তু সহজে কেহ তাহা জানিতে পারিত না। তাঁহার ইহা গুপ্ত রাখিবার অপূর্ব্ব শক্তি ছিল। এই গুপ্ত রাখিবার চেষ্টাও অবশ্য তাঁহার অন্তর্নিহিত বিনয়েরই পরিচায়ক।

এই বিদ্যানুরাগের ফলেই ভবিষ্যতে বঙ্গবাণী তাঁহার নিকট হইতে শব্দালঙ্কারবিভূষিত সারগর্ভ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ সকল উপহার পাইয়াছে। এই সাহিত্যজ্ঞানের ফলেই বঙ্গবাণী তাঁহার শেষদান বঙ্গভাষার অমূল্য সম্পৎসমূহের অন্যতম 'অভিভাষণ' লাভ করিয়াছে। এই অভিভাষণে এক দিকে যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অপর দিকে তেমনি হৃদয়ের অদম্য বল—অসীম সাহস প্রকাশ পাইতেছে। এই অভিভাষণ হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার সৎসাহস যে কেবল সামাজিক ব্যাপারেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; উহা সাহিত্যক্ষেত্রেও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের "সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা" ও আমার "আর্ট ও সাহিত্য" গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইবার ফলে বঙ্গীয় লঘুসাহিত্যক্ষেত্রে যে বিক্ষোভ উঠিয়াছিল, তাহা প্রশমিত হইতে না হইতেই পুনরায় আমাদের মতের অনুমোদন করা—'সত্যং শিবং সুন্দরং'—যাহা কিছু ভদ্র, যাহা কিছু কল্যাণ, তাহাই আর্টের মূলপ্রাণ—এই মত প্রচার করা বড় অল্প সৎসাহসের পরিচয় নহে।—বিশেষতঃ যখন বড় বড় সাহিত্যরথিগণও আর্টের নামে প্রকারান্তরে অশ্লীল ভাবকেই উৎসাহ দিতেছিলেন।

তিনি যে কিরূপ মনেপ্রাণে আর্টের এই সত্যস্বরূপকে ধারণ করিয়াছিলেন, প্রভাত বাবুর সহযোগে সম্পাদিত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকাটিই তাহার প্রমাণ। যখন অধিকাংশ মাসিক পত্রের গল্পে ও প্রবন্ধে আর্টের মিথ্যারূপকে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস চলিতেছিল—যখন অশ্লীলতাকেই আর্ট সংজ্ঞা দিবার অল্পবিস্তর চেষ্টা চলিতেছিল—তখনও, আমার যতদূর স্মরণ হয়, 'মানসী ও মর্ম্মবাণীতে' আমি সে ভাবের কোনও চিহ্নই দেখি নাই—বরং উহার বিপরীতে প্রকৃত আর্টকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াসই লক্ষ্য করিয়াছি। যেমন সামাজিক সংস্কারে, তেমনি এস্থলেও তিনি নিন্দার সম্ভাবনাকে গ্রাহ্যও করেন নাই। তিনি যাহা ন্যায়সঙ্গত বুঝিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন; নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হন নাই।

আজ তিনি সকল নিন্দা-প্রশংসার ঊর্দ্ধে। তথাপি বন্ধু বন্ধুর বিয়োগে যে আঘাত পায়, সাহিত্যিক সাহিত্যিকের তিরোভাবে যে বেদনা অনুভব করে, বেদনার সেই আঘাতই আজ অতীতের স্মৃতি আমার মনে বহন করিয়া আনিতেছে। সেই বেদনা হৃদয়ে রাখিয়া আজ স্বর্গগত মহারাজের পরিবারবর্গের সহিত একচিত্তে তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া এই স্মৃতিকথার উপসংহার করিলাম। *

গ্রন্থ-পরিচয়।

রাবেয়া। শ্রীহেমমালা বসু প্রণীত। কলিকাতা ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

তপস্বিনী রাবেয়ার চরিত-গাথার পুণ্য গন্ধে আরবের ধর্ম্ম-সাহিত্য সুরভিত হইয়া আছে। ইনি আজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া নানা দুঃখ-কষ্ট-বেদনার মধ্য দিয়া অবশেষে ভগবৎপ্রেম-লাভে ধন্য হইয়াছিলেন, এবং

* 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', মাঘ—১৩০২ সাল।

দীনসেবাকেই জীবনের একমাত্র ব্রতরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই পুণ্যময়ী রমণীর পবিত্র জীবনকাহিনী অবলম্বনে শ্রদ্ধেয়া লেখিকা নাতিদীর্ঘ ষোলটী সর্গে আলোচ্য কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যদিও ইহাকে ঠিক মহাকাব্য বলা চলে না; তথাপি বাঙ্গালা ভাষায় সত্যই ইহা একখানি মহাকাব্য হইয়াছে। কারণ দরিদ্র-গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও 'রাবেয়ার' মত একজন যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণা ও মহিমময়ী নারীর চরিত্র ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগ প্রধানতঃ গীতিকাব্য ও কোষ-কাব্যের যুগ হইলেও লেখিকার এই প্রচেষ্টা যে সর্ব্বাংশে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে, ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিতে পারি। বিষয়-নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার গল্পাংশের প্রয়োগকৌশল ও লিখন-ভঙ্গি প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীজন-সুলভ কোমলতা ও পবিত্রতায় মণ্ডিত। মাতৃজাতির নিকট হইতে আমরা যতখানি আশা করিতে পারি, লেখিকা তাহা হইতে আমাদিগকে একটুও বঞ্চিত করেন নাই। রচনার মধ্যে কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা বা কষ্টকল্পনা দেখিলাম না, যাহা বর্ত্তমানযুগের কাব্য-সাহিত্যের একটা লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সর্গের পর সর্গ ঝর্ণাধারার মত ছন্দের উচ্ছল গতিতে রসের ধারা ঢালিয়া অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে।

কাব্যখানির মধ্যে প্রধানতঃ রাবেয়া ও সোফীর চরিত্রই মুখ্য; এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দিক দিয়া ইহারা অপূর্ব্বও বটে। বিশেষত রাবেয়ার ভগবদ্ভক্তির তুলনা নাই, দিবসের কর্ম্ম-অন্তে নিভৃত নিশার জ্যোৎস্নাবিধৌত শান্ত উদার নীল আকাশের অভিমুখে তাকাইয়া ঊর্দ্ধমুখী রাবেয়ার সেই করুণ কোমল প্রার্থনা-বাণী—

'আমার হৃদয় জুড়ি বস তুমি, ভগবান!
শিখাও আমারে প্রভু, গাহিতে তোমার গান,
করিতে তোমার কাজ, বলিতে তোমার বাণী,
দেখিতে নয়ন ভরি, মহান্ মুরতিখানি;
রয়েছ অদেখা হয়ে জগতের কোন্ পারে!
বল দেব, কোন্ পথে সেথা সবে যেতে পারে?
কোন্ পুণ্য কত ভক্তি, পাথেয় লাগিবে তার,
কত নয়নের অশ্রু মরমের হাহাকার?'

এখনও যেন হৃদয়ের মাঝে ঝঙ্কার তুলিয়া ফিরিতেছে।

আর একটী জিনিস আমাদের বড় ভাল লাগিল। লেখিকা কোথাও স্রষ্টার গৌরব লইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান নাই, তিনি বরাবরই তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলির পাশে পাশে তাহাদের সখী ও সঙ্গিনী হইয়া ফিরিয়াছেন, তাহাদের সুখ ও দুঃখের হর্ষ ও বিষাদের তুল্য অংশ লইয়াছেন। কাব্যখানির আদ্যোপান্ত শেষ করিয়া মনে হইল, আজ যেন কেমন করিয়া হৃদয়-মনের অনেক দিনের রুদ্ধ দুয়ারগুলি হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে; সেখানকার বহুদিনের বদ্ধ বিষাক্ত বায়ুর পরিবর্ত্তে ফোটা ফুলের গন্ধে ভরা খোলা হাওয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে।

১৬ পেজি ডবল ক্রাউন আকারে ১৬২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নাটোরের মহারাজাধিরাজ জগদিন্দ্রনাথ ইহার একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। দুইখানি ত্রিবর্ণিক হাফটোন চিত্রে সুশোভিত। ছাপা ও কাগজ ভাল। স্বর্ণমণ্ডিত বাঁধাই অতি সুন্দর। ১৪নং রাজাবাগান জংসন রোড, কলিকাতা গ্রন্থকর্ত্রীর সমীপে ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ (প্রথমার্দ্ধ)—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত। মূল্য ২॥০ মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশ উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য একখানি প্রধানতম ও প্রাচীনতম উপনিষদ। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ আটটী অধ্যায় ও প্রত্যেক অধ্যায়ে অনেকগুলি করিয়া খণ্ড আছে। বিষয়ের বাহুল্যে, গুরুত্বে ও প্রাচীনতায় ঔপনিষদ সাহিত্যের মধ্যে এক বৃহদারণ্যক ছাড়া ইহার সমকক্ষ আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের আলোচ্য এই সংস্করণে উক্ত বৃহৎ গ্রন্থের প্রথম চারি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'পদপাঠ' অর্থাৎ প্রত্যেক পদের স্বতন্ত্র বাঙ্গালা অর্থ, অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্য্যঘটিত সুবহুল মন্তব্য প্রভৃতি বর্ত্তমান সংস্করণকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই অংশের জন্য পাঠকগণ পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্নের নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই। তবে আমাদের ধারণা, তাঁহার মন্তব্যগুলির সকল অংশ সাধারণ পাঠকের উপযোগী নহে, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে সব সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করিয়াছেন সাধারণ পাঠক তাহার মূল্য বুঝিবে না। অবশ্য ইহার দ্বারা তাঁহার শাস্ত্রালোচনার গভীরতা ও প্রসারতা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক খণ্ডের বিষয়-নির্দ্দেশক শিরোলিপি, সুবিস্তৃত বিষয়ানুক্রমণিকা ও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি-বিষয়ক ভূমিকা প্রভৃতিও এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য। এই অংশের জন্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় পাঠকগণের ধন্যবাদার্হ। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকাটী আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ইহাতে তিনি ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যাকে প্রতীচ্যদর্শন-শাস্ত্রের আলোকে অভিনব ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণী শক্তির ফলে সমগ্র অংশটী বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

"সুপ্রসিদ্ধ ঋষি বৈশম্পায়নের নয় জন শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম তাণ্ড্য। তাণ্ড্য ঋষি সামবেদের একটী শাখার প্রবর্ত্তক। এই শাখার নাম তাণ্ড্যশাখা। এই এই শাখার অন্তর্গত একখানা 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের নাম 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ'। * * এই 'ব্রাহ্মণে' দশটী অধ্যায় আছে। শেষ আটটী অধ্যায়ের নাম 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ'।" সম্পাদকের এই 'গ্রন্থপরিচয়ে' বেশ তথ্য-সংগ্রহের চেষ্টা আছে।

এই উপনিষদের প্রায় প্রত্যেক অংশই এক-একটী 'বিদ্যা' বা 'উপাসনা'। এই 'বিদ্যা' বা 'উপাসনা' বলিতে পরমার্থ চিন্তা বুঝায়। এই উপাসনা বা পরমার্থ-চিন্তার প্রধানতঃ তিনটী স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তরের উপাসনা যজ্ঞ ও সামগানের সহিত সম্বদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের আধ্যাত্মিক উপযোগিতা আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বাহ্যিক অনুষ্ঠানপ্রধান ধর্ম্ম হইতে ধ্যানপ্রধান ধর্ম্মে জাতীয় ক্রমোন্নতির ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে ইহাদের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় স্তরের উপাসনা সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক। এই স্তরের উপাসনাগুলি জগতের বিচিত্র বস্তুতে, ব্রহ্মের উপলব্ধি সাধনে নিশ্চয় উপযোগী। তৃতীয় স্তরের উপাসনা নির্গুণ-ব্রহ্মবিষয়ক। ব্রহ্মের জগদতীত—দেশকালের সীমাতীত, অনন্ত অখণ্ড-স্বরূপ উপলব্ধি বিষয়ে এই স্তরের উপাসনাগুলির বিশেষ উপযোগিতা আছে। 'ছান্দোগ্যে'র প্রথম চারি অধ্যায়ে প্রধানতঃ উপরিউক্ত দুইটী স্তরের উপাসনা স্থান পাইয়াছে। শেষ চারি অধ্যায়ে বিবিধ আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া তৃতীয় স্তরের উপাসনাই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা সেই দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যা ও আলোচনা পাঠের জন্য উৎসুক রহিলাম।

ডবল ক্রাউন আকারে ২৬৮+৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বর্ণমণ্ডিত বাঁধাই সুন্দর, ছাপা ভাল; কাগজ মধ্যম।

শ্রী সু. চ. বে.

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

বিবাহ—বিগত ২৬ শে ফাল্গুন বুধবার গোধূলি-লগ্নে শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরলোক-গত সাহিত্যিক ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অমিতা দেবীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান এই নব দম্পতীকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বর্ষশেষে সান্ধ্যোপাসনা।

আগামী ৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটী বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন, এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

নববর্ষে সান্ধ্যোপাসনা।

নববর্ষ উপলক্ষে ১লা বৈশাখ বুধবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

নববর্ষে প্রাতরুপাসনা।

পরদিন ১লা বৈশাখ বুধবার নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। তদুপলক্ষে প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।